শালগিরার ডাকে

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

উৎসর্গ

ভারতের আদিবাসী
সমাজকে

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই

হাজার চুরাশীর মা

হাজার চুরাশীর মা ও অন্যান্য নাটক

শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা

অরণ্যের অধিকার

ইটের পরে ইট

চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর

নৈর্ঋতে মেঘ

অগ্নিগর্ভ

কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু

লায়লী আশমানের আয়না

১৭৫০ সালে দেশের অবস্থা কেমন ছিল তার কিছু জানত না ভাগলপুর থেকে রাজমহল অবধি জঙ্গল এলাকার মানুষরা। তারা সাঁওতাল, তারা পাহাড়িয়া, তারা মালপাহাড়িয়া। আন্দোলিত প্রান্তর, ঘন জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড়। বড় প্রাচীন এ অরণ্যভূমি। ভারতের ইতিহাসের বহু কথার নীরব সাক্ষী ভাগীরথীর পশ্চিমে রাজমহল থেকে জঙ্গল এলাকার বিস্তার ওদিকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের অবধি—উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিণে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ অবধি।

তখনো সাঁওতাল পরগনা, দামিন-ই-কোহ্ নামগুলি অজানা। বর্গী ফৌজের বার বার হানাদারিতে বিপর্যস্ত বাংলা সুবা। কিন্তু কে তার খবর রাখে?

সাঁওতালরা রাখত না, পাহাড়িয়ারা রাখত না, মালপাহাড়িয়ারা রাখত না। জঙ্গল আছে, শিকার আছে। পাহাড়িয়া ও মাল-পাহাড়িয়াদের আছে জঙ্গল জ্বালিয়ে জুম চাষ। সাঁওতালদের আছে জঙ্গলহাসিলী জমিতে ধান, ডাল, সর্ষে। মহুয়া তেলে বাতি জ্বালো। রিঠার বিচিতে কাপড় কাচো। লবণের দরকারে চলে যাও দূর গ্রামের হাটে। লবণ কেনো, কেনো কাপাস তুলো। সুতো কাটো, তাঁতে বুনে নাও কাপড়। কে নবাব আলিবর্দি, কে রঘুজী ভোঁসলে, কোথায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লালমুখো বেনেরা, কে তার খবর রাখে?

কেউ খবর রাখে নি। ১৭৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তখনো তীব্র শীত। সাঁওতাল গ্রামটিতে ঘরে ঘরে দিনেই জ্বলছিল আগুন।

একটি ঘরের সামনে মেয়েরা অপেক্ষা করছিল মুর্মুদের ঘরে। মুর্মু, হাঁসদা, সরেন, হেমব্রম, কয়েক গোত্রের সাঁওতাল গ্রাম। বাড়ির বড় বউয়ের ছেলে হবে। সন্তান হবার জন্যে অপেক্ষা করার মধ্যে আছে আনন্দ। বিশেষ সুন্দ্রা মুর্মুর ঘরে। সুন্দ্রা বীর, শিকার উৎসবের

সময়ে কেমন করে যেন তারই হাতে চলে যায় নেতৃত্ব। সুন্দ্রার ওপর সকলের অগাধ বিশ্বাস।

সুন্দ্রা এই জঙ্গল, বির্-এর আশ্রয় ছেড়ে সাহস করে লখা সরেন ও আটোয়ারি মুর্মুকে নিয়ে চলে গিয়েছিল গিরিয়া। সেখানে এক রাজপুত সামন্তের জমিতে চাষবাস দেখেছিল। গিয়েছিল অবশ্য স্বভাবের ছটফটানিতে। থেকে থেকেই সুন্দ্রা বলত, যাই—ধারতিটা কত বড় দেখে আসি খানিক।

পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের গায়েই থাকে। থাকে মালপাহাড়িয়ারা। একবার তো সুন্দ্রা ভরা শীতে মাঘী অমাবস্যায় চলে গিয়েছিল এক মালপাহাড়িয়া গ্রামে। সেখানে তখন ওদের গাঁওদেওতার পুজো হচ্ছে। সুন্দ্রার বাবা ধমক দিয়েছিল, মালপাহাড়িয়ারা পরব করছে নিজের মনে। গাঁয়ে সবাই ভাল থাকবে, তাতে গাঁওলি সাত বোন দেবতার পূজা করছে। আমাদের আখন পরব, সাহজোম বাহা পরবে তারা আসে? নিজের মনে পরব-পূজা করবে মানুষ, তুই অমনি কাঁড় ধনুক নিয়ে সেথা হাজির! যে যার গোতে থাকে, পরবে থাকে, গাঁয়ে থাকে, পরবে দোষও লেগে যায় বা-বাতাসে—এমন কাজ করতে নাই।

সুন্দ্রা কথাটি না বলে কাঠ ফাড়তে লেগে গিয়েছিল। তারপর, যেন কতই শান্ত ছেলে, এমনি গলায় বলেছিল বাবাকে, শোন আপুং, হাটে গিয়ে বসে থেকে নাহেল-কুড়ি-টাংগা মেরামত করানো কি সম্ভব?

নাহেল কুড়ি টাংগা—লাঙল-কোদাল-কুড়াল তো বরাবর সেভাবেই সারানো-গড়ানো হচ্ছে। বাবা ভেবে পায়নি ছেলে কি বলতে চায়?

তবে নাহেল-কুড়ি-টাংগাকে বলে দিই? নিজে নিজে মেরামত হয়ে আয় তোরা।

না আপুং, তুমি সমাজকে নিয়ে বোস, কথা বলে দেখ। গ্রাম সমাজে কি বলে।

তুই কি বলিস ?

আমি বলি, সার্জোম হাটে সাত গ্রামের সমাজ মিলে রাজমহল থেকে কামার এনে বসত করিয়েছে। আমরা কেন না কামার-কুমার-ছুতার এনে জমি দিয়ে বসত করাই না ? সেই তো হাটে ধান-চাল-সর্ষে বেচে সব কিনি ?

জমি দিয়ে বসত করাব ?

তুমি আমাদের সমাজে প্রধান, মাঝি। যা ঠিক হবে তাই করবে। আমি তা বলতে পারি ?

তারা আসবে ?

সমান জমিনের দেশেও তো তাদের বসত করিয়েছে জমি দিয়ে। তাতেই যদি সকলের চলে যেত তা হলে দিনমণি কামার হাটতলায় বসত ? বলে দেখতে হবে।

না, এ কথাটা ভেবে দেখি। পাঁচজনকে বলি।

খিদে পেয়েছিল সুন্দ্রার। খেতে বসেছিল তাড়াতাড়ি। বাথুয়া শাক, ভাত, বেগুন পোড়া, খরগোশের মাংস, করমচার আচার। খেতে দিয়ে মা বলেছিল, কেমন পরব দেখলি ?

সে কি বলি আয়ু, আগে পায়রা, তারপর পাঁঠা, তারপর মোরগ বলি দেয়। দেহার, ওদের পুরুত সব করে। রক্তমাখা চাল যে যার ঘরে নিল।

কেন ?

লক্ষণ একটা। এ চাল ঘরে থাকলে বিপদ নাই আর। তারপর সিন্দুর লেপা ডিম একটা। থানের সামনে ভাঙল। দেখে দেখে আমি চলে এলাম।

সুন্দ্রার বউ সোমী বলল, খাওয়া-দাওয়া নাই ?

আছে। পাঁঠার মাথা দিয়ে খিচুড়ি হবে, মাংস হবে, বেটাছেলেরা খাবে। তা বাদে কি বল্ ?

নাচ আর গান।

ঠিক বলেছিস। বুলুং দে।

লবণ দিয়েছিল সোমী। বলেছিল, গোহালের আগড় না বাঁধলে বাঘে আবার গরু নিবে।

বাঘ কোথা ? লাকড়া হবে।

না না, গুলবাঘা। গাছে উঠে ঝাঁপ দেয় কি লাকড়া ?

বাঁধব আগড়।

মা বলল, আমগাছটার ডাল না কাটলে হবে না।

গাছগুলি সুন্দ্রার প্রাণ। সুন্দ্রা বলল, মা ! নতুন ফল দিতেছে. ক বছর যাক।

তোর গাছের জন্যে আমার গরু যাবে ?

লোহার ঘর বেঁধে দিব।

লোহার ঘর হয়নি। কিন্তু তরুণ শালচারা কেটে ঘন ঘন করে বসিয়ে হল ঘর। ঘরের ভেতরে মাটির দেয়াল। চাল হল সেই কাঠের গুঁড়ির মাথায় সার সার গুঁড়ি ফেলে। সুন্দ্রার গোহালঘর দেখতে এল সবাই। দেখে সবাই তারিফ করল। তাগড়া পুষ্ট গরু মোষ নিতে বাঘ এলে আলাদা কথা। বেশি ক্ষতিটা করে চিতাবাঘ। যা হোক, এ ঘর থেকে গরু বা মোষ নিতে হচ্ছে না।

এই সব কাজ সেরেই একদিন ও লখা সরেন ও আটোয়ারি মুর্মুকে নিয়ে চলে যায় গিরিয়ার কাছে। সেখানে চারদিন থেকে সব দেখে-শুনে ফিরে এসে বলল, সমাজ ডাক।

কেন ?

আমরা খেসারি বুনি তারা ধান না পাকতে ছোলা, অড়হর, মাস-কলাই, সকল ডাল বুনে। আমরাও বুনব। চাষটা বাড়াতে ক্ষতি নাই কোন। কিনব না কিছু।

এখন নয়। শিকারপরবের পর সকল জনা মিলি। তখন বলিস। তুই কি যাস এই সব দেখতে ?

হাঁ হাঁ, আর পাহাড়িয়াদেরও বলব।

তা বলতে হবে। সমাজ না বসতে বলবি ?

বলব, আমরা দেখে এসেছি, সমাজে কথাটা হবে।

তা বলতে পারিস। মোটামুটি আমরা তিন জাতি আছি। আমরা পাহাড়িয়া-মালপাহাড়িয়াদের বলব, ওরা আমাদের বলবে। এমনি করেই চলছে।

কত বড় ধরতি, জমি হাসিল করে নেবো আরো ?

নেব, তা নেব।

দিনমণি কামারের কথাটাও বলবে। কি বা করেছে, তার বুঝি জাতপাঁত গেছে। আমি বললাম, আমাদের জাতপাঁতের বিচার নেই। দোষেগুণে পাঁচজনের বিচার। তবে জমি হাসিল করে দিতে হবে খানিক। আর কাজ যা করাব, ধানে চালে দাম। পেটে খাক, হাটে বেচুক, কত চাই ?

এই অরণ্যবনের বাইরে তখন অষ্টাদশ শতক। অষ্টাদশ শতক মানে কত যে গোলমাল, তা সুন্দ্রারা জানেনি।

শিকার পরবের পর সে সমাজ বসে। তাতে সব কথাই হয়। শুধু অতি বৃদ্ধ সনা কিসকু বলেছিল, বাইরে থেকে কামার আনবি তোরা ? আমাদের সমাজ একরকম, বিচার একরকম। তাদের বিচারবুদ্ধি বা কেমন হবে ?

আমরা দেখে নেব অন্যায় করলে।

তাতেও দেরি হয়নি ওদের। দিনমণি কামার এসেছিল। কামারশালা খুলেছিল। তাতে তার মন বসেনি প্রথমে। বনজঙ্গলের গভীর গহনে মাঝে মাঝে নদীর ধারে, ঝর্ণার ধারে শস্যশ্যামল গ্রাম। এরা ক্ষেতে কাজ করে, সন্ধ্যায় গান গেয়ে ঘরে ফেরে। পাল-পরবে নাচে-গানে মেতে ওঠে।

দিনমণি তার ভাই রতনমণিকে বলেছিল, জাতপাঁত নেই, এরা কি মানুষ ?

রতনমণির বয়েস কম, বুদ্ধি বেশি। সে বলেছিল, জাতপাঁতে কি

করে ? না জেনে মুচির অন্ন খেলাম, তা বলে বিপদে পড়লে নিয়ম খাটে না ! তাতে অমন লাঞ্ছনা করল ? ধান পাচ্ছ, চাল পাচ্ছ, ডোল ভরা চিড়ে মুড়ি, জীবনে এত দেখেছ ?

দিনমণির বউ, রতনমণির বউ এরা খুশি হয়েছিল খুব। কামার, সে লোহার কাজ করে। তীরের ফলা, বর্শা, সড়কির ফলা। কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, দা, নিড়ানি। এমন দরকারের কাজ যে করে তার সম্মান কত। দুধ, মাছ, দই, মাংস, যার যার ঘরের জিনিস এনে দিয়ে যায়। জমিতে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, কচু, লঙ্কা আছে নাও। গরু রাখতে চাও, রাখো। ধানের জমি ? সেও ওরাই পালা করে শ্রম দিয়ে যায় মেয়ে-পুরুষ। এত সুখ পায় কে ?

কিন্তু দিনমণি এনেছিল বহন করে সভ্যতার সৃষ্ট লোভ। সে মাঝে মাঝে যায় কহলগাঁও, সংগ্রাম-পুর। যায় নিজের কাজের জিনিসপত্র আনতে, যায় ছেলে খুঁজতে। তার ছেলেরা বড়, মেয়েটি কোলে। রতনমণির মেয়ের সাত বছর হল। বর খুঁজতে খুঁজতে কোন্ না আট বছর হবে ? আর নামের সঙ্গে এক সময়ে একঘরে হবার কলঙ্ক লেগে আছে। দেশঘরে বর খুঁজলে হবে না। দূরে খুঁজতে হবে।

সুন্দ্রা বলল, তুই যাস কোথা থেকে থেকে ?

ময়নার বর খুঁজতে যাই।

ময়নার বর খুঁজিস ? ওই অতটুকু মেয়ের বিয়ে দিবি না কি তুই ?

আমাদের ঘরে ওইরকমই হয়।

ও যে আমার মেয়েদের সঙ্গে খেলে ?

তোদের সমাজে আনরকম রীতকরণ।

সুন্দ্রা বলল, তা তো দেখছি। কোন্ সমাজটা ভাল ?

যার যার কাছে তার তার সমাজ ভাল।

তোর সমাজের তো দেখছি দুটো জিনিস মন্দ।

কোন্ কোন্‌টা রে ?

ভাল কারিগর তুই, তোর ভাইটা। তোদেরই জাতপাঁতের কথা তুলে বের করে দিল সমাজ থেকে। আমি তো এর কোন মানেই বুঝি না। এই একটা মন্দ জিনিস।

এর নাম জাতের বিচার।

জাত আবার কি ? হাঁ, গোত্ আলাদা হতে পারে। কিন্তু জাতও আলাদা ?

হ্যাঁ রে।

আর দেখছি এতটুকু মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিস তোরা। কি বোঝে ও সংসারের ? এও খুব মন্দ কথা।

এও জাতের নিয়ম।

তোদের সমাজটা কি রকম ?

তোরা বুঝবি ?

নে, তুই বোঝ্।

ময়নার ঘরবর খুঁজতে গিয়েই দিনমণি এক চাঞ্চল্যকর খবর পায়। মারাঠা বর্গীরা মুর্শিদাবাদ যেতে চায় লুঠ করতে। রাজমহল পাহাড় ও বন দিয়ে কোনো সিধা সড়কের খোঁজ দিয়ে যদি কেউ সাহায্য করে, হাতে হাতে একশো এক সিক্কা টাকা পাবে। কড়কড়ে রুপোর টাকা।

শুনে মাথা ঘুরে গেল দিনমণি কামারের। প্রথমেই সে কথাটা বলল, রতনমণিকে।

কয়েক বছরে রতনমণির ধ্যান-ধারণাও পাল্টেছে। সে বলল, কিসের দরকার তোমার ? ধানের খামারে ধান, গোয়ালে গরু, সাত-দশটা গ্রামে মানখাতির পাচ্ছ, আর কি চাই ?

মেয়ের বিয়ে দিবি না ?

দেব, সে হবে'খন।

টাকা পেলে আমরা তো চলে যেতেও পারি।

আমি যাব না।

দিনমণি বলল, সুন্দ্রার বাপ নিশ্চয় তেমন পথ জানে। সে সব জায়গা চেনে, জানে।

দাদা, অমন কাজ কোর না। বর্গীরা যদি এতপথ ঠেঙিয়ে এসে থাকে, বাকি পথও চলে যাবে। এ হল রাজা গজার লড়াই। এতে তুমি কেন মাতছ?

দিনমণি সে কথা শুনল না। বন আছে, জঙ্গল আছে, পাহাড়ে আছে দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়ারা। নইলে সে নিজেই খুঁজে খুঁজে পথটি বের করত। বাঘ, ভালুক, হাত্তির ভয় আছে।

সে গেল সুন্দ্রার বাবার কাছে। সুন্দ্রার বাবা সব শুনল। শুনে বলল, তুই একশ টাকা পাবি?

তোকেও দেব।

আমিও পাব। ভালো।

কি বলিস? জানিস তেমন পথ?

এই বর্গীরা কারা?

অনেক দূর দেশের লোক।

যেতে চায় কোথা?

মুর্শিদাবাদে।

দিনের আলোয় খেয়া পেরিয়ে যাক না কেন?

লুঠতরাজ করতে আসছে।

তাতেই দিনমানে খেয়া পেরোবে না?

বুঝিছিস তো সবই।

কথাটা তুই ভুলে যা।

কি বললি?

সুন্দ্রার বাবা আস্তে কেটে কেটে বলল, কথাটা তুই ভুলে যা। তুই যা বলছিস সে তো বেইমানি। লুঠতরাজে ডাকাত আসছে, ডাকাতকে পথ দেখাবি, পথ দেখিয়ে টাকা নিবি, সে টাকা আমাকেও দিবি। এ

কথা যে বলে তার মাথা সাঁওতাল মাটিতে ফেলে। ফেললাম না কেন, তা তুই বুঝিস ?

হেই, হেই দেখ মাঝি, শোন।

শুনলাম তো। তোর মাথাটা ফেললাম না। কেন ? কেন না ডেকে এনে বসত করিয়েছি আর তখনি বলেছি, নির্ভয়ে থাক্ তোরা। তোদের জান মানের জিম্মাদারি আমরা করব। তাই মারলাম না তোকে। কিন্তু, বেইমান তুই, এখানে থাকতে দিব না আর।

তবে যাব কোথা ?

খানিক ভয়ে, খানিক আবেগে কেঁদে ফেলেছিল দিনমণি। সুন্দ্রা পাথর পাথর চোখে চেয়ে লম্বা ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুন্দ্রার বাবা বলেছিল, কাঁদছিস ?

যাঃ ও কথা ভুলে যা।

আমি ভুললে তুই ভুলবি ?

আর বলব না।

যা, ঘরে চলে যা। সুন্দ্রাটার হাত নিশপিশাইছে, আমার হাত নিশপিশাইছে, যা যা চলে যা।

দৌড়ে চলে গিয়েছিল দিনমণি। পরদিন দা ধার করতে নিয়ে গিয়ে সুন্দ্রা বলে এল রতনমণিকে, কাল খুব বেঁচে গেল তোর দাদা। আর যদি শয়তানি করে, তাহলে আর বাঁচবে না। তুই কি বলিস, শুনেছিস সব ?

আমি তো নিষেধ করেছি বার বার।

রতনমণি দা-টা হাতে নিয়ে দেখল। বলল, জল খাওয়াতে হবে যে এটাকে। বসবি তুই ?

বসি। হাপরের আগুন, তোর কাজ দেখতে ভাল লাগে।

রতনমণি দা তাতাল লাল টকটকে করে, জল ছেটাল। লোহা যত জল খাবে তত টনকো হবে। আবার তাতাল, নেহাইয়ে রেখে খানিক পিটে নিল, জল ছেটাল। তারপর ছেনি কেটে নিয়ে উঁখো

দিয়ে ঘষতে থাকল। কাজ করতে করতেই রতনমণি বলল, বারণ করেছি আগেই। ভাল আছি, জল ঘোলা কোর না। তা ময়নাটাকে ভালবাসে বিস্তর। তার বিয়ের জন্যে···

এ ভাল নয়, ভাল নয়। অনেক ভেবে সুন্দ্রা বলল, ওকে আর হেথা হোথা যেতে দিস না। ময়নার তোর ভাল বিয়ে হবে। কাজ শিখছে কত। আমার মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে তো।

দিনমণির বউ ওকে চারটি মুড়ির লাড়ু দিল। বলল, খা তুই। বউ খেল, মেয়েরা খেল, বাপ খায় নাই।

দে। লাল গাইটা তোদের বনের ধারে যায়। গুলবাঘা দেখলে মেরে দিবে। সামলে রাখিস।

বড় পাজি ওটা। দূরে দূরে যায়। রতনমণি পরে দাদা বউদিকে বলল, এরা বেইমানি, মিছা কথা জানে না। যা বলেছ আর বোল না। এই জঙ্গলে কেটে রাখলে কে দেখছে? আর বনজঙ্গল যে বলো, ভাল আছ। আমার মন তো খুব বসেছে এখানে।

তোর মেয়ের বিয়ে?

হাটে নাপিতকে বললে হবে। সুন্দ্রার বাপকে বলব, নাপিত, কুমোর এ সব দরকার।

রতনমণির কথা শুনে সুন্দ্রা বলল, দেখি।

দরকার নয়?

দরকার তো। কিন্তু বাইরের লোক এনে বসত করাতে হলে সমাজ বুঝবে। আমার মুখ নাই।

সবই দিনমণির কারণে। রতনমণি তা ভাল করেই বুঝল। তারপর বলল, ছুতোর, নাপিত, ধোপা, কুমোর পাঁচ কাজের জাত গ্রামে বসত করলে বাইরে যাবার দরকার পড়ে না।

আমি বলতে পারি না।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে সব সমস্যার সমাধান হল।

দিনমণির সমস্যার সমাধান সে নিজেই করল। সে তো জানত

না ইতিহাস সবসময়ে এক সঙ্গে কত স্তরে কাজ করে। রাজরাজড়ার ইতিহাসে ঘটনাগুলি ছুটে চলে যায় বুড়ি ছুঁয়ে। আর সাধারণ মানুষের ইতিহাসে প্রতি ঘটনা গভীর, গভীর সব পরিণাম সৃষ্টি করে। বর্গীরা এল বাংলা লুটতে—রাজরাজড়ার ইতিহাস।

তাদের আসার পথ খুঁজতে হন্যে হয়ে বেরোল দিনমণি। পাহাড়ে জঙ্গলে কোথাও আছে পথ, আছে। পথ আছে, তা জেনেও ওরা বলছে না, টাকা নিচ্ছে না সেই লোকটার কাছ থেকে। লোকটা পার্বত্য গিরিপথে ঘাটিদারের কাজ করে। টোপটা সেই দিয়েছিল দিনমণিকে। পথ আছে, তবু এরা বলছে না। পথটি খুঁজে পেলে একশো এক টাকা। অনেক টাকা। ময়নার বিয়ের কথাও আর ভাবছে না দিনমণি। জমজমাট জনপদে ফলন্ত ধানের খেতের বিঘা প্রতি সালিয়ানা খাজনা ছয় আনা এক বছরে। একশো এক টাকার ক্রয়ক্ষমতা অনেক। ঘর ওঠে চারখানা. জমি হয়, হাল-বলদ-গাইগরু হয়, আম-কলা-নারকেল বাগান হয়. তারপরেও হাতে থাকে কিছু। ভালো বসতি গ্রামে।

রতনমণির না হয় বনজঙ্গলে মন বসেছে। দিনমণির মনে হচ্ছে চেনাজানা ছবির মত গ্রামজীবন। পুরনো জগৎই ভাল। একশো এক টাকা! দিনমণি জানে, এই টাকাতে গ্রাম দেশে ইট পুড়িয়ে দালান দেওয়াও চলে। পথটা পেতে হবে, পথ। পথ দেখতে যাবে এক পুঁটলি সর্ষে নিয়ে। সর্ষের চিহ্ন দেখে দেখে বর্গীদের চিনিয়ে দেবে।

টাট্টু ঘোড়ায় চেপে দিনমণি চলে গিয়েছিল সেপথ খুঁজতে। যেতে যেতে ও পাহাড়িয়া-বসতিয়া পাহাড়ের দিকে যায়। পাহাড়িয়াদের কাছে বাইরের মানুষ মানে গভীর সন্দেহের পাত্র তা দিনমণি জানত না

তারপর আর খোঁজ নেই, খোঁজ নেই। দিনমণির বউয়ের কান্নাকাটিতে কয়েকদিন বাদে সুভদ্রা আর রতনমণি বেরোয় দিনমণির

খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা হয় তিনজন পাহাড়িয়া যুবকের সঙ্গে। সুন্দ্রাকে দেখে ওরা দূর থেকেই বলে, কে সাথে ?

কামারের ভাই।

কামার ? কোন্ কামার ?

গ্রামের নয়াবসতিয়া কামার।

কামার কোথায় ?

তাকেই খুঁজছি।

ক দিন হল পাস্ না ?

তা পাঁচ দিন হল।

ঘোড়া চেপে বেরিয়েছিল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

যুবকরা এগিয়ে আসে। ধনুকে ভর রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে বলে, কামার বলে জানি না। কামারের আদর আমরাও করি। তবে লোকটা ভাল নয়। এসেছিল, পথ খুঁজছিল, সুঁড়ি পথ। পথের খোঁজ দিলে ওকে কে টাকা দেবে, ও টাকা দেবে আমাদের।

রতনমণির গলা শুকিয়ে গেল। সে বলল, তারপর ?

যুবকগুলি ওর দিকে চাইল না। সুন্দ্রাকে বলল, তোর বাপের কথাও বলল, সে না কি বোকা। টাকার দাম বুঝে না। সুন্দ্রা মুর্মু, এ সব কথা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

সুন্দ্রা আস্তে বলল, কাঁড় মেরে দিলি ?

কাঁড় মেরে দিলাম।

কোথায় ?

ওইখানে। এ লোক তার ভাই ?

সুন্দ্রা রতনমণির কাঁধে হাত রাখল ও নামাল। তারপর বলল, এ জন আমার জিম্মাদারিতে এসেছে। বুঝিস্ ?

বুঝি।

এর দাদাকে…ঘোড়াটা ?

নিয়ে যা।

পাহাড়িয়ারা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বড় বড় ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়েছিল দিনমণি। ঘোড়াটি কাছেই চরছিল। একটি যুবক বলল, সরষের পুঁটলি নিয়ে এসেছিল। সরষে ছড়িয়ে চিহ্ন করবে, চিহ্ন দেখে পথ চিনাবে।

সুন্দ্রা বলল, কি করবি দাদাকে?

কি করব?—রতনমণি অসহায়।

আমাদের সমাজে অপঘাতে মরলে কিছু করি না। বনেজঙ্গলে ফেলে দিব। না হলে অমঙ্গল ডেকে আনে।

আত্মঘাতীর জন্যে কোন শাস্ত্রীয় বিধান নেই তা রতনমণিও জানত। বিনা অনুষ্ঠানে দাহ করাও যাবে না। কেন না সুন্দ্রারা সাহায্য করবে না। দাদাকে বহে নেবে কে? সে একা?

কি করবি?

ঢেকে দিই একটু।

গাছের ডালপালা ভেঙে ঢেকে দেয় রতনমণি দাদাকে। ভবিষ্যতে কখনো সুযোগ হলে জেনে নেবে কি ভাবে এর কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা যায়।

ঘোড়াটি নিয়ে রতনমণি ও সুন্দ্রা ফিরতে থাকে। সুন্দ্রা বলে, তোর দাদা সব সময়ে তোদের সমাজ মোদের সমাজ করত। তোদের সমাজে সবই মন্দ রে। বাবা বাঁচিয়ে দিল সে হল বোকা আর এমন কারিগর সে জনা, এমন মানসম্মান দিলাম, জান লড়িয়ে ধান উঠিয়ে হামার ভরে দিলাম, কিছু মনে রাখল না।

রতনমণি চোখ মুছল।

করমগাছের সামনে তোর গায়ে হাত রেখেছি, জিম্মদারি নিয়েছি তোর জানের। ধর্মটা রেখে চলিস যদি, তবে তোদের কারো গায়ে কাঁটা বাজার আগে আমি বুকের রক্ত দেব।

হ্যাঁ।

মনে রাখিস।

চলে গিয়েছিল সুন্দ্রা।

আর বর্গীরা এল, বর্গীরা এল। ধান নেই, বাড়ি জ্বলছে, মেয়েদের ইজ্জত লোপাট। রাজবৃত্তের ইতিহাসের ধাক্কায় গণবৃত্তের ইতিহাসে নতুন স্তর সংযোজন। মানুষ পালাতে থাকল। কোথায় পালালে নিষ্ঠুর বর্গী পিছনে ধাওয়া করবে না? চলো নদী পেরিয়ে। বর্গী কখনো ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে নামতে চায় না। বড় নদী পেরিয়ে তারা আসবে না। চলো পদ্মা পেরিয়ে, ভাগীরথী পেরিয়ে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালাল পুঁথির ভার নিয়ে। সোনার বেনে পালাল নিক্তি হড়পি নিয়ে।

গন্ধবণিক পলায় দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি
পলায় কত॥
কামার কুমার পলায় লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলায় লইয়া
জাল দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগির ভয়ে সব পলাইল।
চাইর দিগে লোক পলায় ঠাঁই ঠাঁই।
ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত
নাই॥

সবাই কিছু দূরে দূরে পালাতে পারেনি। যারা চলে আসে জঙ্গলের এপারে, তারা সাঁওতাল গ্রামের আশ্রয় পেল। বর্গী চলে যেতে ফিরে যাবে, তখনো তারা তাই ভাবল। কিন্তু তারপরেও বর্গী আসা অব্যাহতই থাকল। ফলে ক্রমে কিছু কিছু কামার-কুমোর-ছুতোর-তেলি থেকে গেল জঙ্গল এলাকায়। বর্গীর হাঙ্গামা চলতে

চলতেই জঙ্গল এলাকার গ্রামগুলিতে এল বাইরে থেকে অন্য সমাজ। এসো, থাকো, জমি হাসিল কর কিছু। কিন্তু গ্রামে গ্রামে আমাদের সমাজপতিদের শাসন মানতে হবে। বেইমানি নয়, বিবাদ নয়, মিথ্যা কথা নয়।

রাজা কে? শাসক কে?

সমাজপতিরা হাসল। কে রাজা? কে শাসক? আমরা কাউকে কর দিই না। সুবাদার? কোনো সুবাদার আজও আমাদের ঘাঁটায় নি। ধান দিয়ে তুলো বা সুতো আর লবণ আনি। বাস্, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক খতম। যূথবদ্ধ হয়ে চ'ল, তীরধনুক সাথের সাথী। রাজা জমিদার তোমাদের দুর্গাপুজোয় আমাদের, পাহাড়িয়াদের, ফল, মিষ্টান্ন, কাপড়, পাগড়ি পাঠিয়ে মান দেয়। সম্পর্ক ভালো রাখে।

তোমরা কার অধীন?

ধর্ম্মের। আমাদের দেবতার।

তাই মেনে নিতে হল। ভালোবাসায় কাঠের পুতুল বশ হয়, এরা তো দুঃখী দুর্গত মানুষ। গ্রামে গ্রামে কামার-কুমোর-ছুতোর ক্রমে বুঝল, এর চেয়ে শান্তিতে তারা বাস করেনি কোথাও। গ্রামজীবনে রোজকার কাজের জিনিসের কারিগরের এত সম্মান পায়নি কখনো। হামারে ধান উঠল, গোহালে গরু। নবান্নের, পৌষপার্বণের, মনসা-পুজোর উৎসব দেখে গেল সাঁওতালরা। বলল, ভাল করছিস এটা।

এইভাবে যখন গ্রামগুলির লোক-বৃত্তে নতুন সংযোজন ঘটল, তখন সুন্দ্রার বউ সোমীর ব্যথা উঠল।

খুব শীত, ফেব্রুয়ারি মাস। দেলকোতে মোয়া তেলের বাতি জ্বালা সন্ধ্যা এল। দূরে পাহাড়ে হাতি নামছে। তাদের তীক্ষ্ণ, তীব্র ডাক শোনা যায়, বাঘের গম্ভীর গর্জন।

নবজাতকের কান্না শোনা গেল।

ছেলে হয়েছে, ছেলে।

গ্রামের সবাই আনন্দ করল। সুন্দ্রা মুর্মুর ছেলে হয়েছে।

সুন্দ্রার ছেলে তিলকা জন্মাল। ১৭৫০ সালে। তিলকার বয়েস বছর না পুরতে সেবার পাহাড়ে নামল হাতি। হাতি তো নামেই বছর-বছর। কিন্তু এবার ওরা চলার পথে পেয়ে গেল পাহাড়িয়াদের ধান ক্ষেত। ব্যস, ধানক্ষেত তছনছ।

পাহাড়িয়া গ্রামপ্রধান এল সুন্দ্রাদের গ্রামে। গ্রামসমাজ, গ্রাম-গাঁওতা প্রধান মাঝি সুন্দ্রার বাবার কাছে। সুন্দ্রার বাবা তাকে বসাল জল ও গুড় দিল। পাহাড়িয়ার আনা মুরগি দুটি ঘরে নিতে বলল সোমীকে। তারপর বলল, এবার বল।

তোমরা ভাল আছ, কিছু জান না।

কেন, কি হল ?

হাতির উপদ্রবে রাত জাগি, দিনে পাহারা দেই। এবার এ কি ব্যাপার বল দেখি ? ঝুড় ঝুড় হাতি, নামছে তো নামছে। এমন সময়ে পাহাড়ে বাঁশ বন, ধানক্ষেতে নামে বা কেন ?

পুজাপরবে কোন খুঁত হয় নাই ?

কোন খুঁত হয় নাই।

তবে ?

এখন তোমাদের চাই। একসঙ্গে হাতি তাড়াতে হবে।

এই কথা। নিশ্চয় যাব।

এই কথা বলতে এসেছিলাম।

না এ কাজ তো করতে হবে। আগুন নিভাতে, হাতি তাড়াতে তোমরা আমাদের আমরা তোমাদের। চিরকাল।

হাতি তাড়াতে গিয়েছিল ওরা। যেতেই হয়। জঙ্গল সমাজের প্রাচীন নিয়ম। যে বিপদ সার্বজনীন, তার মোকাবিলায় সকলকে যেতে হবে। অন্য সময়ে যে যার মত থাকতে পার। হাতি এসে পড়েছিল

ধানক্ষেতে। অন্ধকারে মশাল ছিটকে পড়েছিল। জ্বলন্ত মশাল গায়ে পড়তে হাতি ক্ষেপে যায়, দাঁতালটা। অন্ধকারে সামনে যাকে পায় মাড়িয়ে চলে যায়। ভোর হতে তবে বোঝা যায় সুন্দ্রার বাবাও নিহত তিনজনের মধ্যে একজন। তারপর দেহাবশেষ খাটুলিতে তোলা। গভীর এক খাদে ছুঁড়ে ফেলা। অপঘাত মৃত্যু অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোন প্রথা অনুমোদিত শবাচার নেই।

ঘটনাটি সুন্দ্রাদের গ্রামকে অভিভূত করে রেখে যায়। গ্রামপ্রধান মাঝি ছিল সুন্দ্রার বাবা। তার নিজের ধানক্ষেত ছিল, গোহালে গরু। মৃত্যুর দিনই সকালে সে নাতিকে নিয়ে বসবে বলে উঠোনে নিচু একটি মাচান বেঁধেছিল। "ওগো, এটি আমাদের সমাজের নিয়ম, এটি করতে হয়" বলে সে সুন্দ্রাদের মত ছটফটে ছেলেদেরও কত শিক্ষা দিত। রগের চুল সাদা হয়েছিল, শরীর যেন পাকা শালগাছ কেটে তৈরি। এমন লোক মানীদামী লোক, সে মরবে নিজের ঘরে। রীতিমত মুর্মু গোতের শ্মশানক্ষেত্রে সমাধি হবে তার। সে মরল হাতির পায়ের নিচে, অপঘাতে?

সুন্দ্রার মা কান্না থামিয়ে বলল, কাই ঢুকে গেল গ্রামে।—অর্থাৎ পাপ ঢুকে গেল।

সোমাঁর মা এসে একদিন বেহানের কাছে বসল। আস্তে বলল, সে ছিল শূরবীর মানুষ, মরল তেমন মরণ। সে কি ঘরে শুয়ে রোগে মরবে? সব রেখে গেছে সে। তোমার সংসার তুমি দেখ। বুক বাঁধো। এই যে নাতিটা, তাকেই দেখ তুমি। চুলে তেল দাও, খাও জুটো।

মন যে চলতে চায় না।

তাহলে আমরা কোথায় যাব?

কেন?

ছিলে মাঝির বউ। এখন হলে মাঝির মা। যার ছেলে গ্রামে প্রধান, তার মার কি অত কাতর হলে চলে?

চলে না, বলছিস ?

সবাই বলাবলি করল, বড় শোকে যেন দপ করে নিভে গেছে মানুষটা। এখন দরকার ওকে রোজকার সংসারে টেনে আনা। মানুষ জন্মেছে যখন, মরবে। আপনজন রইল যারা, শোক লাগাবে তাদের। এ সবই জীবনের নিয়মে হচ্ছে। শীত-বর্ষা-গ্রীষ্ম যেমন নিয়মে আসে আর যায়, যায় আর আসে—তেমন নিয়মে হচ্ছে। এখন ওকে সংসারের নিয়মে টেনে আনা দরকার।

প্রৌঢ় পরভু হেমব্রমের বুড়ি মা বলল, রোজকার কাজে আসুক, সেই হল অষুদ। এর মত অষুদ নাই। তুই কি রে সোমী, এই কাজটা করতে পারছিস না ? চল্, দেখি।

সোমীদের উঠোনের মাঝে মাসকলাই শুকোচ্ছে। বুড়ি এল তার ধাড়ি মাদী ছাগলের দড়ি ধরে, ছেড়ে দিয়ে বলল, খা খা, মাসকলাই খা।

সুন্দ্রার মা দাওয়ায় বসেছিল খুঁটি হেলান দিয়ে। এ হেন দৃশ্য দেখে সে একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। ছাগল তাড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল বাড়িতে কি মানুষ নেই রে ? তোরা কোথায় গেলি ? পরভুর মা বুঝি পাগল হয়ে গেল। জ্বলজ্বল করছে গোটা কলাইগুলো, ছাগলের দড়ি ছেড়ে ঠেলে দিল সেদিকে ?

ছাগল বাঁধল পরভুর মা। ঝাঁটা নিয়ে ছড়ানো ছিটানো কলাই জড়ো করল আবার। তারপর শিশু তিলকাকে এনে কোলে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, নিজের ধানকলাই নিজে সামলা. ছেলেটাকে দেখ্। সব ছেড়ে আকাশ-পানে চেয়ে ভোমা মেরে বসে থাকলে আবার দেখিস কি কার।

নে, বুঝেছি।

আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সব। সুন্দ্রা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার মা আর সোমী ধান ঝাড়ল, পিটল। মা আবারও বলল, তুষ রাখতে আরেকটা ডোল বানা।

ভাল ডোল এনে দিব।

কোথা পাবি?

বর্গীর ভয়ে পালিয়ে এসেছিল, ওরা ডোম। ওই গাড়া পারের টোলিতে আছে। বাঁশ চিরে চিরে ডোল-কুলা-চুবড়ি-চেটাই বুনে কি রকম! খুব ভাল সমাজটা। আমাদের মত মেয়েমরদে কাজ, আমাদের মত শুয়োর মুরগি পোষা, মরদরা আমাদের মত শিকার করে, লড়তে পারে।

তীরেই লড়াই?

না, ওরা লেজা ছুঁড়ে, সড়কি।

রকম রকম মানুষ আসল।

চাঞি ধানুকরা আসছে। ব্যাধ হয় এরা। খানিক শিকার করে আয়ু, আবার ছাগল ভেড়া পালে। শেখার জিনিস কত আছে ভেড়ার লোম কেটে লয়ে হাটে বেচে। কম্বলিয়ারা কিনে! কম্বল বুনে। কিন্তু টাকা নিল, চাল কিনল, খুব খেল, বাস।

তারপর?

ধানুক না এরা? শিকার করে।

তোকে ভাবতে হবে তো এখন, এদের রকম রকম সমাজের সঙ্গে আমাদের চলবে কেমন?

খুব চলবে। এখানে থাক, করখাজনা কি বলে ওরা, তার বালাই নেই। বর্গী এসে লুঠবে না কিছু। খাটো, খাও, হাটে গিয়ে নিজের পসরা সওদা বেচ, আমরা দেখতে যাব না।

বাইরের লোক সব!

এদের থেকে বিপদের ভয় নেই কোনো। দিনমণি কামারের কথা সবাই জেনে গেছে।

কেমন করে জানল, হ্যাঁ সুন্দ্রা?

আয়ু, এ সব কথা বা-বাতাসে চলে।

হ্যাঁ, কথার ডানা আছে।

তিলকাকে বুকে নিয়ে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সুন্দ্রার মা। ছেলে বড় হয় দিনে দিনে। বাবা বড় হয়েছে শুধু সাঁওতাল সমাজে। আর তিলকা যে গ্রামে বড় হয়, সেখানে এখন কামার-কুমোর-ডোম-তেলি-চাঞ্জিধানুকরাও দু ঘর, এক ঘর এসে বসেছে।

সুন্দ্রারা সর্ষের খন্দ করত। কখনো সর্ষে ভাঙিয়ে আনত। নইলে বেচে দিত। তেলের কাজ চালাত মহুয়া তেলে। মহুয়াটি লক্ষ্মী ওদের। ফুলের পাপড়ি পিঠে ভেজে খাও। পুরস্ত ফুল সেদ্ধ করে নাও। কিসমিস ফেলে খাবে, এমন মিঠা। কয়েকটা খেলে মুখ মেরে যায়। মহুয়ার বিচি শুকিয়ে নাও। কাঠের পেষাইচাপটায় পিষে তেল বের করে নাও।

কুমোর-বুড়ি সুন্দ্রার মাকে বলল, কি সুখে মহুয়া তেল খাস মা? গন্ধ নাই?

সুন্দ্রার মা হেসে বলল, খেয়ে দেখ।

খেয়ে দেখার আগে যা কিছু মনে উটুরখুটুর,—খেয়ে কুমোররা দেখল এ তেল চমৎকার। ঘরে তৈরি কর, খাও, বাতি জ্বাল। কিছু দিনের মধ্যেই ঘরে ঘরে পেষাইটা দেখা গেল। রতনমণি বলল, আগে জানি নাই। শিখার অনেক আছে তোদের কাছে। এখন দেখতে পাচ্ছি।

সুন্দ্রা বলল, আমাদের যা করব নিজেরা।

চিড়ামুড়ি করিস না কেন তোরা?

সকালে খাব জলভাত, কাজে যাব যে-যার মত। দুপুরে খাব গরম ভাত। রাতে খাব গরম ভাত। চিড়া কোটে, মুড়ি ভাজে কে? মেয়েরা কাজ করে না?

বেচতে পারিস।

কি হবে? আমাকে যখন মাটিতে গর্ত করে সমাজ দেবে, তোকে যখন জ্বালাবে, তখন কি পয়সা সব নিয়ে যাব আমরা? ও কথা ছাড়। লোহার বাটি চাই একটা।

বাটি? হঠাৎ?

সুন্দ্রা হাসতে লাগল। বলল, আয়ুর কথা আলাদা। নতুন বাটিতে তেল গরম করে ছেলেকে মাখাবে। নতুন লোহার গুণে ছেলের ভাল হবে। আয়ুটা তোদের সমাজের কাছে শিখছে নাকি এ সব? ছেলের আদর এত? তোরা তো মেয়ের চেয়ে ছেলেকে আদর করিস বেশি বেশি।

রতনমণির বউ বলল, মাঝি দেওর বুঝে না। তোর বাপ মরল দেওর, তাতে মনে শোকতাপ ছিল। ছেলেটাকে নিয়ে সব ভুলেছে। তাতেই বেশি আদর করে।

ঠাকুমার আদরে যত্নে তিলকা বড় হল। ঠাকুরদা মরে গেছে ১৭৫০ সালে, তার এক বছর না পুরতে। ঠাকুরদা, গড়মবাবা বলতে সে জানে একটা ধনুক, তার ছিল। আর একটা মস্ত কাঠের খোরা। এই খোরাতে গড়মবাবা আমানি খেত। খোরাটা তার আপুং, সুন্দ্রা এনে দিয়েছিল হাট থেকে।

ওই ধনুকটা একদিন তিলকা নেবে, ওই খোরাতে খাবে আমানি। বড় হলে।

এখন সারাদিন নেচে বেড়াও, কাঠবিড়ালি, পাখি ধরতে চেষ্টা কর। এখন তুমি বড্ড ছোট। তোমার আপুং শিকার করে আনে হরিণ, বুনোবরা পাখি। তুমি অবাক হয়ে দেখ। তোমার মা, বাবা, দিদিরা চলে যায় ক্ষেতে। গড়ম্ আয়ু, তোমার ঠাকুমা পরিচর্যা করে মোষ গরুর। তোমার মেজ দিদি, তালা দাই যায় গরু চরাতে। তোমার গড়ম্ আয়ু রাঁধে ফেনাভাত, খরগোশ শিকে গেঁথে ঝলসায়। তুমি খাও নুনমরিচে।

এত সব গাছপালা, পাহাড়পর্বত, পাখি, ফড়িং, সাপ, জীবজন্তু, এসব কোথা থেকে এল? তুমি অবাক যাও। রাতে তারুপ আসে, বাঘ। বাবা তাড়ায়। বাঘ নিতে চায় কাড়ি, মোষের বাচ্চা। বাবা তাড়ায়। পাহাড়ে হাতি নামে, হাথহি। ঝুড় ঝুড় হাথহি। চেঁচিয়ে

বাঁশ পিটিয়ে, আগুন জ্বেলে কারা হাতি তাড়ায়। ওরা পাহাড়িয়া। পাহাড়িয়ারা আসে না কারো সামনে। বনে আগুন জ্বালে ওরা। আকাশ পানে আগুন ওঠে, দেখতে কত সুন্দর। দেখে দেখে অবাক মান তুমি।

গড়ম্ আয়ু, আগুন লাফায় কেন আকাশ পানে? আকাশ পানে ওঠে কি করে? আগুনের কি জীবন আছে?

ওরে, ওরা আগুন লাগিয়ে জমি সাফ করে চাষ করে। আমরাও আগে করতাম, আর করি না।

ওরা ভাল?

সবাই ভাল।

এমনি অবাক হতে হতে তুমি বড় হতে থাকো। আট বছরে ধর্মকর্মের প্রধান নায়েকে এসে তোমার হাতে দেন ধনুক আর তীর। তিলকা মুর্মু তুমি, তিলকা মাঝি হবে তুমি একদিন। ঠাকুমা বলে, চোখ বুজলে দেখতে পাচ্ছি তিলকা মাঝিকে সবাই মান দিচ্ছে কত। —ঠাকুমার কথা শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। হাতে তীর ধনুক নিয়ে তোমার লাফ ঝাঁপ কত। তাকুপ মারব, হাথ্হি মারব, স—ব মারব!

তোমার জগৎ তোমার গ্রামটুকু। তাই তুমি জানতে পার না, তোমার গ্রামের মত অনেক অনেক গ্রামের কেউ জানতে পার না, তোমার সাত বছর বয়স হল যখন, সেই ১৭৫৭ সালেই তোমাদের গ্রামের পূবে ভাগীরথীর ওপারে কি কাণ্ডটা হয়ে গেছে। পলাশী নামের একটা জায়গায় রাজায়-রাজায় এক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় বাংলার নবাব হেরে গেছেন, খুন হয়ে গেছেন। সাহেবদের দেওয়া তাজ মাথায় পরে নবাব হয়েছে মীরজাফর।

কিছু জান না তোমরা। সাহেবরা কবে থেকে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে ঢুকছে। নবাবের কোষাগারে এত এত সোনাদানা হীরেমোতি কোথা থেকে আসে? তারা সেই আসল জায়গা কবজা করতে চায়।

লক্ষ কোটি মানুষ চাষ করে আর তাঁত বোনে আর কাজ করে। তাদের কোটি কোটি হাতের পরিশ্রম, ঘাম থেকে এত সোনাদানা তৈরি হয়। সাহেবরা সেই আসল জায়গা কবজা করতে চায়। তোমরা জান না কিছুই।

তোমরা আর পাহাড়িয়ারা চাষ করতে জান। এই বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকায় কেউ লোভের হাত বাড়ালে তোমরা তীরধনুক নিয়ে জান কবুল করে নেমে যাবে লড়তে। তোমরা জান তোমরা স্বাধীন। কোনো শাসকের অস্তিত্ব তোমরা জান না। মোগল আমলে, বাংলা সুবার আগের নবাবের আমলে তোমাদের কেউ খাজনা দিতে বলেনি। বরঞ্চ পরগনাদার, চাকলাদাররা তোমাদের সম্মান জানিয়েছে তাদের দুর্গোৎসবে।

বাইরের জগৎ থেকে যারা এসেছে, তারাও তো গরিব-গুরবো খেটেখাওয়া মানুষ। কোন বিরোধ হয়নি। শাসক নেই, তবু সমাজগুলি নিজেদের শাসনে রাখে—লোভ নেই, চুরি নেই, জাতপাতের দুঃশাসন নেই—এমন জীবনে এসে তারা তো তোমাদের কাছে পরম কৃতজ্ঞ।

এখনো তোমাদের, তোমার জগৎ কত নিশ্চিন্ত।

তিলকার চোখে এই অরণ্যপৃথিবী অনেক মায়ায় ঢাকা। চেঁড়ে, পাখি হয়ে উড়ে দেখে আসতে সাধ যায় অরণ্যের সীমা। বিইং, সাপ হয়ে ঢুকে যেতে সাধ যায় মাটির গহ্বরে। হাথ্‌হি, হাতি হয়ে প্রবল দাপে মাটি কাঁপিয়ে চলতে সাধ যায়। দারে, গাছ হয়ে উঠে যেতে সাধ যায় আকাশপানে। বির্‌, বন হয়ে ঢেকে ফেলতে সাধ যায় রুক্ষ মাটি যত।

গডম্‌ আয়ু, এসব কোথা থেকে এল?

ঠাকুমা ওকে কোলের কাছে বসায়। ক্ষিপ্র হাতে ঘাসের দড়ি পাকাতে পাকাতে বলে, সব বলব।

ঠাকুমার কাছে ও জেনে যায় সব। যা না জানলে সাঁওতাল জনমটা বৃথা। এ জানা রক্তে বহে চলে, রক্তে ধরে রাখতে হয়।

নইলে তিলকা কেমন করে তার ছেলে-মেয়েকে জানাবে সব সত্য? এ যে জানতেই হয়।

কথাগুলি বলে ঠাকুমা পরম স্নেহে বালক তিলকাকে এই বন ও ধান ক্ষেতে ঢাকা পৃথিবীর মধ্যে ওর ঠাঁই কোথায়, সেই ঠিকানাটি জানিয়ে দেয়। শরতের সন্ধ্যায় ঘরের মেঝের বসে হিম হিম বাতাসে একটু কেঁপে তিলকা শোনে সে কথা।

গোনা যায় না রে, আকাশে যত তারা দেখিস, তা কি গুণতে পারিস? তেমন অগণন, অগণন চাঁদ আগেকার কথা। তখন এ ভুবনে কোথাও কিছু ছিল না। কেউ নেই, কিছু নেই, কোথা থেকে উড়ে এল এক ধপধপে সাদা বুনো হাঁসিল। এত বড় হাঁস, দুধের ফেনার মত সাদা, আকাশের ইন্দা চাঁদোর মত সাদা। সেই হাঁসিল পাড়ল দুটি সাদা, গোল বেলে।

সেই বেলে ফুটে বেরিয়ে এল একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাই আমাদের প্রথম মা, প্রথম বাবা। পিলচু বুড়ি, পিলচু হাড়াম। এদের সন্তানদের থেকে এল প্রথম সাতটি গোত। কে বলে তারা হিহিড়িতে ছিল, কে বলে তারা আহিড়িপিড়িতে ছিল। তখনকার কথা তিলক, সব যেন অনেক জানি, অনেক জানি না। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে তারা এল খোজকামান। এখন বল দেখি আমাদের কি কি পরব দেখিস?

আখন, মাঘ-সীম, সার্জোম বাহ, আরো-সীম, মাহ্‌মারে, রোহিন্‌, আষাঢ়িয়া, মোর আতি, নওয়াই, জস্তাল, বোঙ্গা-রাকাব, শাক-রাত কত কব? এই এ—ত পরব।

হ্যাঁ হ্যাঁ। তা পরব তো করি, করতে হয়। কিন্তু খোজকামানে ওদের কিসে বা দোষ হয়ে গেল, ব্যস্‌।

কি হল?

আকাশ থেকে যেমন জল নামে শ্রাবণে, তেমন নামল আগুন। আগুনের বৃষ্টি পড়ল খোজকামানে। এক মেয়ে, এক মরদ উঠল

হারৎ পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে আগুন নামল না। আর সব পুড়ে মরে গেল।

তারপর মেয়েমরদ গেল সমান জমিনের দেশ শাশাংবেড়া। তার পর গেল জারপি। জারপিতে ছিল মারাং বুরু। পাহাড় পেরিয়ে যে আনদেশে যাবে তার পথ কোথায়? মারাংবুরুর বোঙ্গাকে পূজা করলে তারা। পাহাড়ের দেবতা খুশি হয়ে তাদের পথ দেখিয়ে দিল। সেই পথ ধরে এল আহিরি। আহিরিতে চাষবাস শিকার করে ঘর বেঁধে বসল তারা। মানুষ তো অনেকটি হল ছেলেপিলে হয়ে। তখন তারা এল কেণ্ডি, তারপর এল ছায় দেশে। তারপরে এল চাম্পা। চাম্পা দেশে অনেক অনেক কাল ছিল সাঁওতালরা। কিন্তু ফলে ফুলে ধানে বনে চাম্পাকে সাজিয়ে নিল যারা, তাদের দেশ দখল করল অন্য সব মানুষ। তখন তারা এল সাওন্ত দেশে।

তারপর কি হল গড়ম্ আয়ু?

আবার মানুষ বেড়ে যায় ছড়িয়ে পড়ে তারা। আমরা ঘুরে ঘুরে এখানে এলাম।

হয়ে গেল?

আর কি, এই আমাদের কথা।

তারপর কি হল?

সোমী ঢুকে পড়ল। বলল, আয়ু, তুই পারিস বকতে। বকে বকে তোর গলা শুকায় না। তারপর মা ভাত রাঁধল। তিলকাকে খেতে ডাকল। খাবি চল। কাল ধান ভানতে আছে, অনেক কাজ।

খেয়েদেয়ে ঘুমোতে গেল তিলকা। হিমেল রাত। তুষের সাঁজালে ঘরে গুম্। ঘুমের মধ্যে সে সেই হাঁসটার স্বপ্ন দেখল। সাঁওতালদের প্রথম মা, প্রথম বাবাকে পেটে নিয়ে হাঁসটা উড়ছে আর উড়ছে। ধপধবে তার ডানা থেকে জ্যোৎস্না ঝরছে। তিলকা ডেকে যেন বলল, ও হাঁসিল, তোমায় দেখেছি এ কথা গড়ম্ আয়ুকে বলব জানলে?— কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠে তিলকা স্বপ্নটি ভুলে গেল।

॥ ৩ ॥

বড় হবার সময়ে তিলকার মত ছেলেরা নতুন বসতি সমাজের সমবয়সী ছেলেদের কাছে শিখল নতুন নতুন খেলা। যেমন ডাণ্ডাগুলি। এ খেলা সুন্দ্রারা খেলেনি।

সে বড় হতে হতে দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর তাদের আত্মীয় সমাজ বড় হল। চাষের সময়ে সবাই সবায়ের ক্ষেতে গিয়ে কাজ করে দেয়। তিলকার কাজও বাড়ল। চাষের সাহায্য কর, আর গরু মোষগুলি চরানো এখন তোমারি কাজ। তিলকাদের বয়সী ছেলেরা গ্রামের সকলের গাইচরী করে। গুলতি বাঁটুল সাথের সাথী। গুলতিতে পাখি মারো, লতায় জড়িয়ে বেঁধে কাঁধে ফেলে ঘরে আনো। তিলকা ডাকাবুকো ছেলে। ডোমদের কাছে সে শিখল লেজা, সড়কি ছোঁড়া।

এই দলমলে ছেলে, শালগাছের মত শক্ত শরীর। চোদ্দ বছর বয়সে তিলকা যেদিন তীর ছুঁড়ে দাঁতাল বরা মারল, ওদের শিকার উৎসবে, সেদিন সবাই তারিফ করল।

এই শিকার উৎসব শুধু ওদের নয়, পাহাড়িয়াদেরও। তিন দিন ধরে চলে এ উৎসব শীতের শেষে। সব চেয়ে প্রিয় উৎসব এটি। তিন দিন আর ঘরে ফেরা নেই। সবগুলি গ্রামের প্রধানরা এক হয়। দশটি, বিশটি, পঞ্চাশটি গ্রামে এক পরগনা। তার মাথা পরগনায়েত। পরগনায়েতরাও এক হয়। সকলে এক হয়ে শিকারের দিন ঠিক করে। পুরুষদের এ উৎসবে দিনমান শিকার খেলে বিকেলে এক জায়গায় মেলা। সেখানে আগুন পোহাও, শিকারের মাংস খাও, পালা করে কেউ জাগো কেউ ঘুমোও। তিন দিন বাদে সকল গ্রাম প্রধানরা এক হয়ে জঙ্গল জ্বালানো জমিতে বসবে লো-বির

সেন্দ্রা বা সেন্দা তুরুপ-এ। এ হল চূড়ান্ত বিচারসভা। এখানে বসে সবাই যে যার গ্রামের অভিযোগ শোনে, বিচার করে মাঝিরা, পরগনায়েতরা।

এ বিশাল অরণ্য এলাকা শত শত মাইল ছড়ানো. গ্রামগুলি দূরে দূরে গড়ে উঠেছে। কোন গ্রাম ছোট, কোন গ্রাম বড়।

তিলকা জানত, তাদের সমাজ মানে গ্রামসমাজ। বাবা সুন্দ্রা মুর্মু যার সমাজপ্রধান, মাঝি। শিকার উৎসবে তেরো বছর বয়েস অবধি সে যায়নি। চোদ্দ বছর বয়েস হল যখন, তখন সে, গোপী, চাঁদো, তিভুবন, হারা, সনা, এই সব ছেলেরা শিকারপরবে যাবার ছাড়পত্র পেল। এতদিন ওরাও এ দিনে শিকার করেছে। দশ বছর থেকে তেরো বছর অবধি ছেলেরা দল বেঁধে গ্রামের কাছাকাছি শিকার করেছে। তিন দিন তিন রাত বনে প্রান্তরে কাটায়নি, আর শিকারের মাংস নিজেরা রেঁধে খায়নি। গ্রামে এসে বনভোজন করেছে। মেয়েরা এসে যোগ দিয়েছে। নাচ গান হয়েছে।

এবার ওরা বড় হল। এবার গ্রামসমাজ ওদের সাবালক হওয়া স্বীকার করল। বাবাকে জিগ্যেস করল তিলকা, আপুং, সকল গ্রামের লোক আসবে?

হ্যাঁ রে।

গ্রাম কত আছে?

অনেক।

কত?

তা ধর তিন শত?

কোথায়, আপুং?

দূরে দূরে।

দেখি নাই?

চোখে দেখা যায় না।

জানবে কি করে?

তোকে এখন জানতে হবে এসব। সমাজের বাঁধন, সমাজের শাসন, সমাজের রীতিকরণ। কাছে থাকি, দূরে থাকি, সকল সাঁওতাল এক সমাজের লোক। সকল হড়, মানুষের—এক সমাজ, গাঁওতা। যখন তুই সাঁওতাল রক্তে জন্মালি, তখন তোর সমাজ এত বড়টা। মনে রাখিস।

হ্যাঁ আপুং মনে রাখব।

শিকারপরবে দূর দূর হতে সকল সমাজের মাঝি আসতে হবে। আর পরগনায়েতদের। অনেক গ্রামে এক পরগনা। পরগনার মাথা পরগনায়েত। অনেক সময়ে এক বড় গ্রামের মাঝি অনেক গ্রামের পরগনায়েত। খবর দিতে হবে।

কেমন করে দিবি?

সুন্দ্রা ঈষৎ হাসে ও বলে, আহিরি-কেণ্ডি-ছায়-চাম্পা-সাওন্তে যেমন করে দিয়েছে আদি সাঁওতালরা! শালগাছের ছালে গিরা বেঁধে প্রচার দেব। পাহাড়িয়ারা প্রচার দিতে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালে। যে দেখবে সেও আরেক পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালবে। আগুন দেখে প্রচার। আমাদের গিরা পাঠালে প্রচার। সবাই জেনে যাবে।

এ সব নিয়ম আমাদের অনেক দিনের?

অনেক দিনের। এতে সমাজ বাঁধা থাকে। বাইরের মানুষ এ সব কথা বুঝে না।

তিলকা বুঝল, কত বড় সমাজের মানুষ সে। ছড়ানোছেটানো গ্রামে গ্রামে কে কোথায় আছে, সবাই গিরার বাঁধনে বাঁধা। সব হেমব্রম—মুর্মু-টুডু-কিসকু-সরেন-হাঁসদা-বাস্কে গিরার বাঁধনে বাঁধা। সকলে এক পরব করে, এক ভাবে গান বাঁধে ও নাচে, এক সার বেঁধে চলে, এ-ওর চাষেবাসে সাহায্য করে, এক ভাবে সমাজের শাসন মানে। এই ভরসা আছে বলেই সাঁওতাল এমন আত্মস্থ, আত্মসম্মানী।

সাঁওতাল সমাজে তাই জীবন আনন্দ করে বাঁচার উৎসব। আর মরণ ?

সওয়া ধারতিরে হাসা হড়মরে
লান্দায় লেকাগে জিউয়ি মেনাঃ।
নওয়া জিউয়ি দ শিশির দাঃ লেকা
অকা দিশম চং অটাং চালাঃ।

এ পৃথিবীতে এই মাটির শরীরে
প্রাণের বাসা, প্রাণের হাসি
এ জীবন ভোরের শিশির
কেউ জানে না কখন তা মিলাবে।

সমাজবন্ধনই সব। শিশু জন্মালে জনমচাতিয়ার আর কেকো-চাতিয়ার অনুষ্ঠান করলে শিশুর নাম হল, সে সমাজের একজন হল। একের ঘরে শিশু জন্মালে সকল গ্রামের অশৌচ চলে। সমাজবন্ধন এর নাম জাতকর্ম, নামকরণ হল, গ্রামসমাজকে খাওয়ালে ভাত, হাঁড়িয়া। অশৌচ কাটল।

সুন্দ্রা ছেলের অবাক চোখ দেখে হাসল, বলল, বাইরে থেকে মানুষ এসে আমাদের সমাজে শামিল হতে চায়। তোরা সে গান শুনিস নাই, শিকারপরবে শুনবি।

গান, শিকার পরবের প্রথম রাতে আগুন জ্বেলে বসে গান শোনা পঞ্চাশটা গ্রামের শত শত মানুষের মুখে।

বাহারেদ সহরায় রেদ
ইঞ হুঁ দাদা লাই আঞপে,
ইঞ হুঁ দাদা আপে জাতি গে।

আপে রেয়াঃ দেওয়া সেবা
ইঞ হুঁ দাদা বাতায় গেয়া
ইঞহুঁ দাদা আপে জাতি গে।

সেনড্রারে দ কারকারে দ
বলনরে সে নেওতাঞ পে,
ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে ॥

আমাকে ডাকো তোমাদের বাহা আর সোহরাই পরবে
সত্যি বলতে কি দাদা
আমি তোমাদের একজন হয়ে গেছি।

তোমাদের পরবপূজার স—ব আমার জানা
সত্যি বলতে কি দাদা
আমি তোমাদের একজনই হয়ে গেছি।

যখন শিকারে যাও তখনো ডেকে নিও আমাকে
সত্যি বলতে কি দাদা
আমি তোমাদেরই একজন হয়ে গেছি ॥
গানে গানে স্মরণ করা অতীতকে—

চাম্পা থেকে সাওন্ত
কত পথ, কত কত পথ
নাগারা মাদল বাঁশির সুরের পথ
ছেলে পিঠে, মাথায় বোঝা, হাঁটার পথ
কত পথ, কত কত পথ
তারপর শাল বন আর ধূ ধূ মাঠ
আর নেচে চলা নদী
সব আমাদের ডেকে নিল
ঝকমকে পিতলের থালার মত সূর্য না ডুবতে
ঝকঝকে পিতলের থালার মত চাঁদ উঠেছিল ॥

এই আশ্চর্য রাতে তিলকা আবার স্বপ্ন দেখল। সে শুয়ে আছে এমন এক মাঠে। ধপধপে সাদা হাঁসিল উড়ে ঘুরে ঘুরে শেষে তার বুকের ওপর বসল। তিলকা চেঁচিয়ে উঠল, আপুং, আপুং, সাদা হাঁসিল আমার বুকের উপর। ঠাঁই খুঁজছিল, ঘুরে ঘুরে এসে বসল।

চেঁচিয়ে জেগে উঠল তিলকা।

জেগে উঠল সকলে। কি হল? কি হল? জানোয়ার এল কোন? রাতপাহারারা কোথায়?

স্বপ্নের ঘোর কাটেনি তিলকার। কাঠ নিয়ে ফেলল কে আগুনে, আগুন খোঁচাল। দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন।

সুন্দ্রা ধমকে বলল, কি হয়েছে?

সাদা হাঁসিল্।

কোথায়?

আকাশে ইন্দ্রা চাঁদোয় নিচ দিয়ে চক্কর মেরে ঘুরছিল আর ঘুরছিল কি সাদা তার ডানা, কত বড়, মেঘের চেয়ে বড়। যেন নামতে চায়, ঠাঁই নাই। শেষে নামে আর নামে আর নেমে আমার বুকে বসল।

তোর বুকে বসল? সাদা হাঁসিল্?

হ্যাঁ বাবা।

স্বপন দেখলি?

হ্যাঁ। আগেও দেখছি, এখন মনে পড়ল।

সকলে সকলের দিকে তাকাল। এই সাদা হাঁসিল্ তাদের বুকে ডানা ঝাপটায়। সকলে চাইল ওপর পানে—তারাভরা রাত। চাইল চারদিকে, পাহাড় ও বন আকাশের পটে লেখা। অপার বিস্ময় আর রহস্যঘেরা এ পাহাড় বন মাটি। আজও, এখনো। তিলকার স্বপ্নটি যেন এই অলৌকিক রহস্যের গভীরের, ওপারের কোনো খবর এনেছে।

আড়াবুরু গ্রামের মাঝি মহর হেমব্রম বলে, সুন্দ্রা! তোর ছেলে কাকে স্বপন দেখল?

কি বুঝিস?

তুই কি বুঝিস?

এ-ওকে শুধায়, সে তাকে। তিলকা আগুনের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে।

অবশেষে মহর হেমব্রম বলে, কাকে স্বপন দেখেছে তা বুঝেছিস তোরা। এখন কথা, এমন স্বপন দেখল কেন? কেন তা কেউ বলতে পারিস?

তুই বল্। মাঝি তুই, পরগনায়েত তুই। জানিস অনেক। তোর বাবাও জানত। তুই বল্।

বেশি কি আর বলব। স্বপন দিয়ে জানিয়ে দিল দুটো কথা। এক, পিলচু হাড়াম, পিলচু বুড়ির সন্তানদের আবার বসত খুঁজে খুঁজে ফিরতে হবে দেশে দেশে। এমন কখন হয়? যখন কোনো বিপদ আসে। তাহলে কথাটা দাঁড়াল, বিপদ কিছু আসছে। তাতে সেই পাহিক আয়ু পিলচু বুড়ি, পাহিক আপুং পিলচু হাড়াম, দুজনার আয়ু সে হাঁসিল স্বপন দিচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে তার সন্তানদের সন্তান সাঁওতালদের আবার বসত খুঁজতে হবে। আর এমন বিপদে, আঃ! গা শিউরে উঠেছে আমার, এমন বিপদে তিলকা কোনো উপায় করবে।

তিলকা? তিলকা মুর্মু?

স্বপনের মানে আর কি হয় আমি জানি না।

তিলকা অবাক হয়ে মহর হেম্‌ব্রমের দিকে চায়।

মহর হেম্‌ব্রম বলে, এখন সবাই মোরা এখানে আছি। কথাটা হয়ে যাক। পুজাপরবে যেন কোনো খুঁত না হয়। আর সেন্দ্রা-দুরুপ্-এ বসার আগে মনে মনে বিচার করে নিবে সবাই। সমাজের কোনো পাপটা, দোষটা যেন বিচারে পার না পায়। কোনো গ্রামে

জাহের থান মাজা লেপা করতে যেন চুক না হয়। এমন স্বপনটা তিলকা দেখল যখন, তখন আমাদেরও ভাবতে হবে দোষ চুক যেন না হয়।

রাতভোর কথা চলে, অনেক কথা।

॥ ৪ ॥

তিলকার চোদ্দ বছর বয়সে, ১৭৬৪ সালে তিলকা সেই আদি রাজহংসীর স্বপন দেখেছিল।

আদি রাজহংসীর সৃষ্ট সাঁওতাল জাতি ও সমাজের ঘর ছাড়ার দিন আসার আগেই অন্য দিকে ঝোড়ো মেঘ ঘনাল। রাজবৃত্তের ইতিহাসে ঘটে ভাগ-বাঁটোয়ারা, চুরি-জোচ্চুরি। অবশ্য সুন্দর সুন্দর শব্দ দিয়ে সত্য ঢাকা থাকে। আর রাজবৃত্তের ইতিহাস তো সাধারণ মানুষের গণবৃত্তের ইতিহাসের ভিতে তৈরি হয়। নিহত সিরাজউদ্দৌলার তোষাখানার সোনাদানা হীরেমোতির উৎস হল চাষীর লাঙল, তাঁতির তাঁত, দুখানা ফাটাচটা হাতের শ্রম। ওদিকে মুর্শিদাবাদ আর কলকাতার মধ্যে নবাব আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার খেলার শুরু তিলকার সাত বছর পুরতে না পুরতে।

১৭৫৭তে তিলকার বয়েস সাত।

১৭৫৭তে মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে একা ক্লাইভ পুরস্কার পেলেন পঁয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা। ১৭৪০-৫০ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রকে একশো টাকা দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে বলেছিলেন ভারতচন্দ্র একশো টাকাতেই বাড়ি তৈরি করেন। একশো টাকায় যখন গৃহস্থমাপের ইটের বাড়ি তৈরি করা যায়, তার কাছাকাছি সময়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকার দাম তাহলে কত?

তাতে তো পঁয়ত্রিশ হাজার একশো বাড়ি তৈরি করে দেওয়া যেত মানী গেরস্তকে। কোম্পানির বড় সাহেবরা পেলেন সাড়ে সাত লক্ষ থেকে বারো লক্ষ টাকা অবধি। কোম্পানি পেল বছরে সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা আয়ের চব্বিশ পরগনার জমিদারী। ঠিক হল, ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের আদায়তসিল থেকে সাড়ে বারো লক্ষ, বর্ধমান-কিষণগড়-হুগলী থেকে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা পাবেন। পরের বছর উনিশ লক্ষ টাকার দায়ে শেষের তিনটি জেলা বন্ধক থাকবে। আর বিহারে সোরা কারবারের একচেটে অধিকার হল ক্লাইভের।

এত সব কেন দরকার হল ?

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবকে সফল করার জন্যে।

তিলকার বয়েস যখন দশ বছর, সেই ১৭৬০ সালে কোম্পানি বুঝল, মীরজাফরকে দিয়ে আর সুবিধে হবে না। গাই বুড়ো হলে কি দুধ দেয় আর ? মীরজাফরকে হাটিয়ে তারা নবাবের জামাই মীরকাসেমকে নবাব বানাল। মীরকাসেম কোম্পানির দাবীদাওয়া মেটালেন। বর্ধমান, চট্টগ্রাম, আর মেদিনীপুর নামেযশে গেল কোম্পানির হাতে।

ভ্যান্‌সিটার্ট পেলেন সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। হলওয়েল পেলেন চার লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা। কোম্পানির অন্য আমলারা পেল দেড় লক্ষ থেকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা হিসেবে।

তিলকা যখন চোদ্দ বছর বয়েসে সেই রাজহংসীর স্বপন দেখছে, তার তা জানা ছিল না কোথায় বক্‌সারে হেরে যাচ্ছেন মীরকাসেম কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে। ১৭৬৪ সালে মীরকাসেম হেরে ফৌত। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির হাতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানির ভার।

তিলকারা কিচ্ছু জানেনি। তখন বর্ষা। ধান রোয়া চলেছে। ঝুপঝুপে বৃষ্টিতে কালো শরীর ভিজছে। মেয়েরা গান গেয়ে চলেছে আর ধান রুইছে।

নদীর ধারে বনের ধারে
ফুল ফুটছে ফুল ফুটছে
ভাদ্র মাসের ফুল।

বাঘ ডাকে না পাহাড়তলায়
বাঘ ডাকছে পাহাড়চূড়ায়
ভাদ্র মাসের দিন।

ফুল তুলেছি চুলে পরেছি
ফুল তুলেছি কানে পরেছি
ভাদ্র মাসের ফুল।

কিছুই জানেন তিলকারা! কিন্তু বীরগঞ্জের হাটে ওদের ধান-ডাল-সর্ষে কিনছিল হাটের আড়তদার। তার কাছ থেকে কোম্পানির গোলদার। এরা কারা? কালো কালো মানুষ?

বাঁকে বহে সার বেঁধে শস্য আনে, কৃষিপণ্য?

রিঠা ফল দেখিয়ে আড়তদার বলেছিল, আনতে পারিস?

না, হয় না।

আমলকী দেখিয়ে বলেছিল, আনতে পারিস?

কত! কত চাই?

এক পাহাড় আমলকী এনেছিল সুন্দ্রারা পরের হাটে। আড়তদার দাম দিতে চেয়েছিল। তাতে সুন্দ্রারা মাথা নাড়ল। বলল, দাম নেব না। আর এনেও দেব না। এগুলো বহে আনলে আমাদের সওদা আনা চলে না। আর আনতে পারব না।

দাম নিবি না? সে কি?

মেয়েদের জন্যে কাঠের কাঁকই আর পুঁতির মালা কিনতে কিনতে সুন্দ্রা বলল, দাম নেব কেন? বনের ফল। আমাদের আনার মেহনত! আজ্জাতে কোন মেহনত নেই।

ধান-ডাল তোদের ক্ষেতের ?

হ্যাঁ রে।

জমিটা সরেশ মনে হচ্ছে।

সাথের সাথী।

ও বাবা !

"ও বাবা" বটে ! বলেছ ভালো। তীরে বিঁধে বাঘ মারে, হাতি মারে, শূরবীর জাত। এদের সঙ্গে কারবার চলে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে চলে না। তারা নামবে পাহাড় হতে দুই মাসে একবার। ধান নামাবে, হরিণের ছাল, হরিণের মাংস। লবণ নেবে, গুড় নেবে, যা দরকার তা নিয়ে চলে যাবে। দু কথা বললে তীর মেরে দেবে। খুব রাগী জাত।

এদের ব্যাপারটা কি ?

ব্যাপার আর কি ! বহুকাল নিষ্কর বাস করছে। স্বাধীন। কেউ খাজনা নেয়নি। নিতে চেষ্টাও করেনি। বন যত, পাহাড় তত, কে যাবে ভিতরে ? শিকার করতে জমিদার গেলে তাকেও তীর মেরেছে পাহাড়িয়ারা। ওরা কারেও খাজনা দেয় না। চাকলাদাররা বরং দুর্গোৎসবে ওদের খেলাত পাঠায়।

কোম্পানি যে শুনছি ডাকের রাস্তা করবে ওদিকে।

করলে মরবে।

তুমি ওদের ভয় পাও না ?

অন্যায় করি না, মান দিয়ে চলি, ভয় পাব কেন ?

এই কোম্পানির ডাক, এই পাহাড়িয়ারা এই নিয়েই প্রথম গোল বাধল। ততদিনে তিলকার বয়েস উনিশ হয়েছে। প্রতিশ্রুত ছিল ওর বাবা। কলাইয়ের বীজ দেবে আড়াবুরুর মহর হেমব্রমকে। বীজকলাই পৌঁছতে গিয়েই মহরের মেয়ে রূপাকে দেখা। রূপা উঠানে ধান শুকাচ্ছিল পা দিয়ে নেড়ে নেড়ে। একাজ ঘরে ঘরে মেয়েরাই করে। কিন্তু তিলকাকে দেখে রূপা যেন চমকে গেল।

হায় গো! কপাটের মত ছাতি, কোঁকড়া চুলে মাথা ঢাকা, শরীর যেন সার্জোম, শালগাছের মত সতেজ। এমন ছেলে তো রূপা দেখেনি এই ষোল বছর বয়েসে?

চমক ভেঙে ও বসতে দিল। বলল, আপুং গেছে ক্ষেতে। আয়ু গেছে মাছ ধরতে। এখনি আসবে আয়ু।

তিলকা হাতের পুঁটলিটি নামিয়ে রাখল, বসল। রূপা ওকে দিল এক ঘটি জল, খাঁড়ি গুড়। এরই মধ্যে এসে পড়ল মহর। মহর হেমব্রম। কি খুশি কি খুশি সে। বড় মোরগ দুটো সরিয়ে রেখেছি, তুই এলে কাটব। ভালো লাল চাল তোলা আছে তুই এলে রাঁধব। রূপা জল দে, পায়ের ধুলো ধুয়ে ফেলুক। ঘরের খবরবার্তা বল্ তিলকা।

খেয়েদেয়ে বিকেলেই ফিরল তিলকা। রূপা সরল হেসে বলল, চৈত্রে আসিস তুই। শুকনা কুল খাওয়াব।

তিলকা হাসল। শুকনো কুল এমন কি জিনিস যে তা খেতে আড়াবুরু আসতে হবে? তাদের গ্রামের জঙ্গলে কত বুনো কুলের গাছ। কিন্তু সে কথা বলল না তিলকা।

তারপর এক হাটে সুন্দ্রা আর মহর হাটের কাজ শেষ হবার পর কি সব কথা বলাকওয়া করল। তিলকা ও রূপার বিয়ের প্রস্তাব। সেই শিকার উৎসবের দিন থেকেই মহরের মনে ধরেছে সুন্দ্রার ছেলেকে। ঘরের মত ঘর, বরের মত বর। সুন্দ্রার ঘর সেজে উঠবে। মেয়ে খুব কাজের। মহরের ছয়টা ছেলেমেয়ে। যে মেয়েদের বিয়ে হয়েছে তাদেরও চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। রূপারও হবে। সুন্দ্রার কাছে এখনি কথা চায় না মহর। ঘরে যাক সুন্দ্রা। মা, বউ, বলুক সকলকে। এখন মহর কথাটি বলে রাখল শুধু।

তারপর মহর বলল, ব্যাপারটা কি বল্ দেখি?

কি?

সাহেবের গোলদার হাটে গরুর গাড়ি এনে ফেলছে, এই জংলা

হাটে। কেন? যত ধান-চাল কিনে নিচ্ছে। কেন? সমান জমিনে চাষী ঘরে ঘুরছে কেন?

আড়তদার বলে সব চাল-ধান কলকাতায় চালান দিবে। এ কোম্পানির ঘর-গুদাম নাকি কলকাতায়। কলকাতা কোথা তা জানি না। ভাগলপুর জানি। ভাগলপুর কাছে। কলকাতা দূরে।

এ যে সর্বনাশা কেনা রে সুন্দ্রা। বাবা! চালের মণ চার আনা। টাকায় চার মণ, পাঁচ মণও মিলে। তা এত এত চাল কেনে, এ কোম্পানির কি জবর টাকা?

কে জানে?

তোরা কি বেচছিস?

না না, তাই বেচি? টাকায় কি করব বল?

আমি তো গ্রামে বলে দিয়েছি. হাটে এখন দেখ. কাচের চুড়ি-গালার চুড়ি-পুঁতির মালা—রংবাহার চুলবাঁধা সুতা—দস্তার মল—এই সব ছড়াছড়ি। এই সব কিনে ঘরে বউ সাজাবে বলে চাল বেচলে মজা দেখাব।

সুন্দ্রার মনে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কথাটা মহর ঠিকই বলেছে। হাট থেকে ফেরার সময় তিলকাও বলল, আপুং, এ কি শুরু হয়েছে? নতুন ধান-চাল সব নাকি বেচে দিচ্ছে পাহাড়িয়ারা? ঘর খালি করে ডোল ডোল চাল বাইছে!

বেচে কি করছে?

কিনছে।

কি?

চুড়ি-মালা-রঙিন সুতা-গামছা-কাপড়, আমি জানি? হাটে বা এত আমদানি কেন?

না না, এ ভাল নয়, ভাল বুঝি না।

আর এক কথা।

কি?

হাটে আমি ঘুরি খুব। জানা যায় কত কথা। ওই পাহাড়ের ওধার দিয়ে কোম্পানি রাস্তা বানাচ্ছে। ডাক যাবে। পাহাড়িয়া বসতির কাছে।

সত্যি?

সত্যি। আড়তদার হেসে বলল, কবে রাস্তা কেটে তোদের জঙ্গল এলাকায় ঢুকে পড়বে।

সুন্দ্রা বলল, তা হচ্ছে না। আর এই ধান-চাল কেনার ক্ষ্যাপামি ভাল বুঝি না।

সুন্দ্রা গোরেত্, দূত পাঠিয়ে খবর নিয়েছিল গ্রামে গ্রামে। হ্যাঁ, সাঁওতালসমাজ এক কথা ভাবে. এক কথা চিন্তা করে। গ্রামের মাঝি পরগনায়েত, সবাই চিন্তিত। কেন চাল কেনা চলছে? কেন চাল যাচ্ছে কোন অদ্ভুত নামের জায়গা কলকাতায়? কেন হাটে এত বেলোয়ারি জিনিসের আমদানি?

সবাই চিন্তিত নতুন এ ব্যাপারে। তারপর কয়েকজন মাঝি ও কয়েকজন পরগনায়েত এক সঙ্গে পরামর্শ করে গিরা পাঠায়। এমন কারণে গিরা কখনো পাঠানো হয়নি আগে। কোশানি নদীর ধারে মস্ত প্রান্তরে এক জরুরী অবস্থায় আজ সাঁওতালরা এক হয়। সেখানে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমরা যেন ভুলে না যাই, বাইরের জগতের, সমাজের সঙ্গে আমাদের লেনদেন সামান্যই। জঙ্গলঘেরা এই জায়গায় নিক্কর আছি আমরা। দরকার আমাদের যৎসামান্য। মাসে একবার দু'বার হাটে যাব। ধানের বদলে চালের বদলে লবণ আর অন্য সওদা নেব, ব্যস্। ছুতার-কামার-কুমার এরা যবে থেকে গ্রামবাসী. সকল কাজ গ্রামে বসে পেয়ে যাচ্ছি। আগে হাটে তবু কখন পয়সা, কখন কড়ি, কখন সিকি নিতাম পণ্যের বদলে। কিনতাম বা করাতাম লাঙলের ফলা, দরজার কপাট, মাটির হাঁড়ি কলসি। সে সমস্যাও নেই আর।

নেই যখন, তখন হাওয়ায় মেতে আমরা ঘরের খোরাক বেচব না।

কিনব না হাটের চোখভুলানো বেলোয়ারি জিনিস। এ ভাল নয়। তারা কিনছে, তারা চালান দিচ্ছে, বাপু হে! সমঝ করে দেখ। এখনো বাংলা পঁচাত্তর সন চলছে, আড়তদার বলে। পঁচাত্তরের পৌষে সকল ধান চাল যদি বেচে দাও ঘর খালি করে—পরের বছর খাবে কি?

দরকারের বাইরে ধান চাল বেচব না।

বেচব না তা জানে বলে হাটের মাঝে বেলোয়ারি জিনিসের ছড়াছড়ি। ধান, চাল বেচ হে, পয়সা নাও, এ সব কিনে নাও।

বেলোয়ারি জিনিস কিনব না।

দরকারের বাইরে হাটে যাব না।

এর অন্যথা করলে বড় ভয়ানক শাস্তি। সমাজের বার। বিটলাহা। বিটলাহার নামে ভয়ে কাঁপে না এমন কে আছে? বিটলাহা হলে তোমার ঘর বংশ সমাজের বার হবে। কেউ তোমার সঙ্গে খাবে না, সামাজিক আদানপ্রদান করবে না। সমাজের কাছে মাপ চেয়ে জমজাতি অনুষ্ঠান করে সমাজে ফিরতে হবে। এত বড় কথাটা বলতে হল আজ। কেন না এ খবর জানা যাচ্ছে কোথাও আছে কলকাতা, কোথাও আছে কোম্পানি। সিকা সিকা চালের মণ। সে কোম্পানির আছে তারার মত অগণন সিকা। আর, সব গ্রাম তো জঙ্গলের গহীনে নয়। সীমান্তে অনেক গ্রাম। সে সব গ্রামে বাইরের খবর আসে বেশি। কোম্পানির লোকরা নাকি চাষী ধরে ঘুরে ঘুরে জবরদস্তি চাল কিনছে। খোরাকি রাখছে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ সদন পরগনাইত হয়। তার কাছে এসে সমান জমিনের চাষীরা বলেছে এ সব কথা। আরো সব দুঃখের কথা। আগে তারা গ্রামে বসে জমিদারের কাছে দরকারে কিছু ধার নিয়েছে। ফেরত দিয়েছে সামান্য সুদ সমেত। যা নিল, তার চেয়ে একটু বেশি ফেরত দিতে হয়। ওদের সমাজের নিয়ম। বাড়তি ধান-চাল-পয়সার নাম সুদ। কোম্পানি এখন গ্রামে গ্রামে সব নতুন লোক ঢোকাচ্ছে। এরা

চাষ করে না, কোনো কাজ করে না। ধার দেয়, সুদ নেয়। এ সব খুব গোলমেলে ব্যাপার। আমরা বুঝব না। তোমাকে দরকারে এক ধামা চাল দিলাম। ফেরত নেব কি দুই ধামা? সেটা অধর্ম হয়ে গেল না?

যাক, একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। এই, কোম্পানি ব্যাপারটা খুব গোলমালের। কোম্পানি ভাল নয়। কলকাতা ভাল নয়। সব নিয়ে যায় কলকাতা।

কেন এ সব হচ্ছে তা আমরা বলতে পারি না।

এই জমায়েতের ফলে বেঁচে যায় জঙ্গল এলাকা। এই "কেন" কথাটির উত্তর সাঁওতালরা জানেনি।

১৭৬৯ সালে সব চাল ধান কিনে ফেলে, কলকাতায় গুদামজাত করে কোম্পানি সরকার সে বছর, ১১৭৫ সালের ভরা শীতেই লাগিয়ে দেবে মন্বন্তর। ১৭৭০ সালের এপ্রিলে পড়বে নতুন বাংলা বছর, ১১৭৬। এ মহামন্বন্তরের নামই হয়ে যাবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। অনেকদিন অবধি লোকে বলবে আর লিখবে এ মন্বন্তরের নানা কারণ: ফসল ভালো হয়নি, অজন্মা চলছিল, এইসব। কিন্তু কোম্পানি সরকার যে আগে ধানচাল কিনে নিল জবরদস্তি—দাম দিল টাকায় চার মণ চাল—আর ১১৭৫ সালের ফাল্গুন থেকেই সে চাল বেচতে থাকল টাকায় চার সের দরে, সে কথা সবাই চেপে যাবে। একেবারে চেপে যাবে যে মন্বন্তর ছিল তৈরি করা। কখনো লিখবে না কোম্পানির তসিলদার-গোলদার যত কর্মচারী সবাই চাল কিনছিল। লিখবে না মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের সেই সাহেব কর্মচারীর কথা —মন্বন্তরের আগে যার এক পয়সা ছিল না। মন্বন্তরের আগে হুণ্ডি লিখে হাজার টাকা ধার নিয়ে যে জবরদস্তি টাকায় ছয় মণ চাল কেনে আর এমন মুনাফা লোটে যে মন্বন্তরের পরেই ইংলণ্ডে পাঠায় ষাট হাজার পাউণ্ড। মন্বন্তর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আসল ইতিহাস এখন অনেক দিন চাপা থাকবে।

মন্বন্তরের করাল ছায়া বনভূমির গহীনে পড়তে দেয় না সাঁওতালরা। ১৭৬৯ শেষ হতে না হতে তিলকা আর রূপার বিয়ে হয়। আর বিয়ের আগেই তিলকা তার সাথের সাথী গোপী, চাঁদো, ত্রিভুবন, হারা ও সনাকে নিয়ে এক দিন হাটে যায়। হ্যাঁ, সব মিলে যাচ্ছে ঠিক ঠিক।

সাঁওতাল ছেলেদের দেখে কোম্পানির গোলদার বলে, হ্যাঁ রে, তোরা চাল বেচা ছেড়ে দিলি কেন?

তিলকা বলে, চাল কিনবি?

কত চাল?

তা ধর দুই-আড়াই শো মণ চাল।

লোভে গোলদারের চোখ চকচক করে ওঠে। সে বলে, কোথায়, কোথায়? সেই তো বলি। এতগুলো গ্রাম তোদের, ধান উঠেছে গোলায়, এখন তো অনেক চাল তোদের ঘরে। আনছিস না কেন, তাই ভাবি। আনলেই তো পয়সা রে। কেবল দেখি চারটি ধান-চাল আনিস, বদল করে সওদা নিয়ে চলে যাস।

চল্, চাল দেখাব।

কোথায়?

কাছেই। এক কোশ হাঁটতে পারবি না?

কি যে বলিস! চাল পাব জানলে এখন আমি দশ বিশ কোশ হেঁটে যাব। চল্ দেখে নিই, দরদাম করে নিই। তারপর গরুর গাড়ি নিয়ে আসব, বহে নেব। চল্ চল্।

হাঁটতে হাঁটতে গোলদার বলল, হাটে এখন রকম রকম জিনিস আসছে। কত চুড়ি, মালা, চুলের সূতা। জংলা হাটে আসে তোদের ভরসায়। তার কাছেও সওদা করতে পারিস পয়সা থাকলে। ধানের বদলে লবণ, ধানের বদলে গুড়, হরিণ ছালের বদলে তামাক, তোদের এখন পয়সার কারবার করতে শিখা দরকার।

তাও শিখব।

ভাল, খুব ভাল। কিন্তু কতদূর রে?

এই তো আর খানিক।

এ তো পথও নয়, জঙ্গলে যাচ্ছি যে।

জঙ্গলেই তো যাব। হেই, দাঁড়া।

কেন কি হল?

গোলদার দাঁড়িয়ে পড়ে। বোকার মত তাকায়। গোপীরা ঘিরে দাঁড়ায় ওকে।

তোরা, তোরা কি মারবি আমায়?

তিলকা বলে, তোর পয়সার থলি কোথায়?

গোলদারের হাত থেকে পয়সার থলিটা তীরের ফলায় তুলে আনে তিলকা। তরুণ তিলকা ভীষণ ক্রোধে কেটে কেটে চাপা গর্জনে বলে, পয়সার থলি ঝমর ঝমর বাজিয়ে যদি কারেও লোভাচ্ছিস্ আর —কোনো পাহাড়িয়া-জঙ্গলিয়ার মাথায় হাত বুলায়ে চাল কিনছিস আর—আজ মারলাম না, সেদিন মেরে দিব।

কোম্পানির চাকর হই বাপ—

কে তোর কোম্পানি? আমরা কোম্পানি জানি না, কলকাতা, জানি না। সকল চাল কিনে নিছিস্, যে বেচল সে খাবে কি? সবার ঘরে ঘরে ঝমর ঝমর থলি বাঁধা আছে, নয়?

মানলাম। মেনে নিলাম।

আর শোন্—তোদের সমাজ শিখায় এমন অধরম। ঝমর ঝমর পয়সা নে, শাক দিয়ে মরিচ, ধান দিয়ে লবণ কিনিস না। পয়সা নে, চাল বেচ্। কেন? ওই লোক দুটা তোরই লোক। ওই যারা চুড়ি-মালা বেচে। ওই সব কেন্ তোরা।

না না, আমার লোক নয়।

নিশ্চয় তোর লোক। আমার বাবা তোদের সমাজ দেখেছে, সে বলেছে যখন, তখন তোর লোক। ফিরতি হাটে যদি ওদের দেখি, কোনদিন দেখি, তবে তীর খাবি তুই, তীর খাবে ওরা। লোভ দেখায়।

লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের দিয়ে পয়সার দামে চাল বেচাবে। ঘরের ভাত বেচে আমাদের বিটিরা তোদের রংকরা মালা পরে নাচবে, নয় ?

উঠিয়ে দেব ওদের। কথা দিচ্ছি।

লে তোর ঝমর ঝমর কোম্পানির পয়সা।

তীর দিয়েই থলিটা ফেলে দেয় তিলকা। কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালায় গোলদার।

অসামান্য সমাজবন্ধনের জন্যে, অসামান্য একতার জোরে এ ভাবেই সাঁওতালরা সুবা বাংলার বিহার-অংশের এক কোণে ইংরেজ বণিকের আগ্রাসী দাবার চাল পরাস্ত করে। পাহাড়িয়ারা পারে না। তাদের গ্রামপ্রধানরা দোস দেয় সমাজকে। কেন এ ভুল করল সবাই ? একে তো পাহাড়ের ঢালে ফলন কম। সে চালও তারা বেচল কেন ? এখন যে হাহাকার, এখন কি হবে ? চাল কিনে খেতে হবে যে ? চাল কিনতে গিয়েই তারা "কোম্পানি সরকার" শব্দটির মানে বোঝে। প্রতি গ্রাম থেকে কয়েকজন করে পুরুষ বাঁক নিয়ে চাল কিনতে যায় কোম্পানির গোলদারের দেওয়া সিকিগুলি নিয়ে। গ্রামপ্রধানদের নির্মম তিরস্কার তাদের বুকে ধ্বনিত হচ্ছে। তারা বলেছে, নিশ্চয় এ একটা চাল কোম্পানির। যত চাল সব কিনে নেবে। সিকিগুলো খরচ করে ফেলব আমরা ! তারপর চাল কিনতে পারব না। না খেয়ে মরে যাব। যা যা তোরা। যত চাল বেচেছিস, কিনে নিয়ে আয়। নইলে কলকাতা নিয়ে চলে যাবে। কোথায় কলকাতা তা কি আমরা জানি ? ভাগলপুর জানি, কহলগাঁও জানি, কলকাতা তো জানি না।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ফিরল তারা প্রায় শূন্য শূন্য বাঁক নিয়ে। মুখ মলিন, বিভ্রান্ত।

চাল কিনলি না ?

সবাই চুপ।

চাল কোথায়? এত এত চাল?

এবার দুঃখে, ক্ষোভে, আর্তনাদে জবাব দিল ওরা। কিনেছে, চাল কিনেছে। প্রত্যেকটি সিকি খরচ করে কিনেছে। তাতেই একেক জনের বাঁকে আট সের, দশ সের চাল।

তা কি করে হয়?

কেমন করে হয় না তাই বল সর্দার? বেচলাম আমরা দু মাস আগে এক সিকা এক মণ চাল। কিনতে গেলাম যখন? আহা সেই চাল, সেই একই চাল, সিকা সিকা সের। বুঝলে? বেচছে কোম্পানির সেই গোলদার।

কি বললি?

সিকা সিকা সের। হেই সর্দার মিছা কথা জানি না, এ কথা যদি মিছা হয়তো চাঁদসূর্য মিছা। হাটতলা নয়, কত দূরে। হেঁটে হেঁটে তবে পৌঁছালাম গোলদারের আড়তঘরে। বাপ রে চালের পাহাড়। আমরা বুঝলাম এটাই তবে কলকাতা হবে? কোম্পানি তো চাল কলকাতায় নিচ্ছিল বলে শুনেছি। এত চাল। এই তবে কলকাতা। বললাম, দেখ দেখ তোরা, নয়ন ভরে কলকাতাটা দেখেনে। আহা কত বড ঘর, কেমন পাকা দালান, কেমন ভারি দরজা, কত বড় কুলুপ। কলকাতাটা বুঝি কুলুপ মেরে এঁটে রাখে। আর এই জোয়ান সব সেপাই কলকাতাটা পাহারায় রেখেছে। পরে শুনলাম ওটা আড়ত। কিন্তু চালের কথা তো জানি না তখনো। পাহাড়িয়া, বোকা আমরা। বলি, কলকাতার সামনে এই এত নেংটা কাঙাল মানুষ, দয়া করো! মরে গেলাম! বলে কাঁদে কেন?

কেন কাঁদে, কেন?

স—ব আমাদের মত বোকা গো! সকল চাল বেচে দিয়েছে। আর এখন সিকা সিকা সের চাল, টাকায় চার সের চাল, এ কথা শুনে কাঁদতে লেগেছে।

সেই চাল কিনলি ?

কিনলাম। আর ভুখা নেংটা মানুষ হাঁটছে কত। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে যে, পড়েই থাকছে।

কোম্পানি বেচছে!

কোম্পানি বেচছে।

গ্রাম প্রধানরা চুপ করে রইল। তারপর বলল, কোম্পানি কি ? পাথর ? পাষাণ ? পাহাড়ের ঢালে চাষ করার দুঃখ জানে না, ক্ষেতের ধান ঘরে তুলার সুখ জানে না। ডাকাত নয় এ কোম্পানি ? কিনে নেয় চার মণ এক টাকা, বেচে চার সের এক টাকা ? শুন্ তোরা কোম্পানি চায় আমরা মরি। কিন্তু মরব না।

কি করব ?

শীতের হিমে কুথি চাষ করব। কুথি দানা ছড়িয়ে নামুতে নামব। যার আছে তার লুটে নেব। আর কোম্পানি ডাক লয়ে নয়াসড়ক ধরে যাবে তো তারে মারব। কোম্পানি ডাকাতিটা শিখাল। এ চালে মাড়ে ভাতে লবণে জাউ রাঁধগা মেয়েরা। ভাগ করে খা।

কাকে লুটবে ? মানুষ মরে যাচ্ছে।

যার নাই তার লুট করব ? যার আছে তার লুটব। লুটেও বাঁচব। পোকপতঙ্গর মত পড়ে যাব আর মরব, তা হবে না।

তবে ?

পাহাড় চূড়ায় আগুন জ্বেলে দে।

পাহাড়ের চূড়ায় আগুন দিব ? দিলাম। লুটব কি সাঁওতালদের। তাদের আছে ঘরে।

এ কথা যে ভাবে সে সমাজের বাহার। আমরা আর তারা, কোন বিবাদ নাই। আমরা তাদের পথে যেতাম যদি, আজ তবে এমন বিপদ হয় ?

তাদের কেন বিপদ হল না ?

সমাজটা বাঁধা আছে। মেয়েদের চুড়ি মালা পরাতে তারা চাল

বেচে নাই। ওই যা বেলোয়ারি জিনিস কিনেছিল, তা ফেলে দে তোরা। ঝমর ঝমর পয়সা। চাল বেচ, পয়সা নাও। পয়সা ফেল, চুড়ি-মালা-রঙিন সুতা কেনো। পাহাড়ের ঢাল ধরে নামব আর কোম্পানির ডাক লুটব।

তারপর ?

চালও লুটব। জমিদার নাই ? চাকলাদার নাই ? তারা বেচে নাই চাল। তাদের কোম্পানির সিকা পয়সায় কিসের দরকার ? তাদের চাল লুটব। যখন চাল পাব না, কন্দ মূল খাব। জঙ্গলটা তো থাকল।

পাহাড়ের চূড়ায় আগুন জ্বলল।

সুন্দ্রা বলল, আমরা গিরা পাঠিয়েছিলাম, ওরা জ্বালল আগুন। কেন ? কেন ?

এই "কেন" কথাটি সাঁওতালদের মনে ঘুরছিল ফিরছিল। অস্বস্তি, অস্বস্তি। এমন শীতের কালে বনে শুকনা পাতা বাতাস যেন উদাস। ভালুক আসে কুল খেতে। বনের রাজা বাঘ যখন চলে তখন শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ অবধি হয় না। হাতি চলে, পালে পালে আর মাঝে মাঝে দেখবে নামু পাহাড়ের ঢালে হাতিরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আকাশপটে আঁকা।

এমন শীতে আগে আমাদের ক্ষেত থাকত শূন্য। সেই যে সুন্দ্রা গেল আর দেখে এল। সেই থেকে আমনের চারা দলমলে হয়ে উঠতে আমরা রবি ফেলি ক্ষেতে। আমন কাটব যখন, রবিশস্যের চারা তখন এক হাত। তার মাথা কাটা পড়বে আমনের সাথে। সে ভাল গো। তাতে গাছগুলি হবে দলমলে।

এমন শীতেও শান্ত মনে পবিত্র চিত্তে আমরা চলি জাহেরথানে মঁড়েকো পূজা দিতে। তিন দেবতার তিন প্রধান দেবতার এক দেবতা মঁড়েকো। এঁকে পূজা করি মনের সাধসাধনা মিটাতে, ভালো শস্য পেতে রোগব্যাধি দূর করতে। মঁড়েকোর বড় ভাই হন মারাংবুরু। বড় অল্পে খুশি দেবতা। সাদা মোরগ, সাদা পাঁঠা বলি দিলেই হল।

মঁড়েকোকে দিই লাল মোরগ, লাল পাঁঠা। এঁদের বোন জাহের-এরাকে দিই লাল মুরগি, লাল ছাগী। মঁড়েকো পূজা বড় পুণ্য পূজা। কত তার অনুষ্ঠান, কত নিয়ম। এমন শীতে পাহাড়িয়াদের ঘরে ঘরে গাঁওদেওতা পূজা সূর্য পূজা। এ পূজা রবিবারে! কত বা তার আচার নিয়ম, কত বা অনুষ্ঠান। পূজাপরবে উৎসবে আমাদের, পাহাড়িয়াদের জীবনের চাকাটি বাঁধা! শীতের ঋতু বড় আপন, বড় ভালো।

অথচ শীতে আমরা পাঠালাম গিরা, ওরা জ্বালল আগুন।

॥ ৫ ॥

পাহাড়িয়াদের যে গ্রামটি কাছে, সে গ্রামের প্রধানের কাছে গিয়েছিল সুন্দ্রা। সঙ্গে গেল তিলকা। সবাই বলেছিল, যেও না। কি করছে ওরা কে জানে। জানতে যেও না।

সুন্দ্রা বলেছিল, জানব না? দুই সমাজ এতকাল সকল অবস্থায় এক সঙ্গে চললাম, আজ জানব না?

পাহাড়িয়া গ্রামটি দেখে বুক ফেটে গিয়েছিল সুন্দ্রার। গ্রাম প্রধান বলেছিল, কি মাঝি?

জানতে এলাম।

কি জানবে?

সর্দার! সকল সুখেদুখে আমরা এ-ওর।

সর্দার গভীর দুঃখে হেসে বলেছিল, বল।

কেন আগুন দেখলাম?

আগুন! দেখলে! তিলকা, তোর বাবা কি বুঝে না কিছু? আগুন দিলাম তাতে দেখেছ, এতে কথা কি?

কেন, কি হল?

সুখেদুখে আপন আমরা, মাঝি? তবে গিরা পাঠালে যখন, যখন

কথা ঠিক করলে যে কোম্পানির লোভের ফাঁদে পা দিবে না, তখন সে কথা আমাদের জানালে না কেন ?

খুব দোষ হয়েছে, মানছি। তবে তোমরা বা এলে না কেন ? জেনে গেলে যখন ? এখন তো আমি না জানাতে এসেছি, আসিনি ?

তাও ঠিক। সাচাই কথা।

তিলকা আস্তে বলল, মনসাকে, তোমার ছেলেকে তো আমি বলেছিলাম সব কথা।

যখন বললি তিলকা, তার আগেই সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সব খুলে বলল সর্দার। তারপর বলল, তোমরা বেরোও না, তাই জান না। গরিব মানুষ আর নেই দেশে। পূজাপরব ভুলে যাও সব। মানুষ মরছে পথে পড়ে। সিকা সিকা পেটের সন্তান বেচে দিচ্ছে গরিবে। ধনীর ঘরের দরজায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে ছেলে।

ফেলে দিচ্ছে।

দেবে না ? যদি খেয়ে বাঁচে, বাঁচুক। সব করল এই কোম্পানি। চার মণ চাল এক টাকায় কিনল। চার সের চাল, তিন সের চাল এক টাকায় বেচে।

কিন্তু, কিন্তু তোমরা ডাকাতি করবে ?

পাহাড়িয়া গ্রামসর্দার নিরানন্দ হাসল। বলল, কোম্পানি একা ডাকাতি করবে ? লড়াই উঠাব না ? বসে মার খাব ?

তাই বল। লড়াই !

মাঝি ! সুন্দ্রা মাঝি ! তোমরা জানবে না গো ! জমিদার লোকরা এই আমাদের পাহাড়িয়াদের কিছু লোক, কয়েক গ্রামের লোককে পাইকান জমি দিয়েছিল—পাইক করে রেখেছিল। আমার তখন বয়েস ওই তিলকার মত। সেথা দেখতে গেলাম। গিয়েছিলাম কিছুদিন। তখনি দেখলাম বাইরের সমাজে রীতকরণ আলাদা। তারা মারলে দোষ হয় না। আমরা মার ঠেকালে ডাকাত হই। তা

বুঝলে কি? তিলকা বুঝেছে। আমরা জানি লড়াই, ওরা বলবে ডাকাত পড়ল। তাতেই ওই কথাটা বললাম।

সব বুঝলাম। মনের দুখ যায় না। আর দোষ না মান তো বলি, বেশি দেবার ক্ষমতাই নেই, তবে গ্রাম থেকে দু মণ চাল দিতে পারব। ছেলেদের পাঠাও আমার সঙ্গে।

দেবে?

দেব কেন? এখন আমি দিলাম, আমাদের টান পড়লে তুমি দিও। দিন সমান যাবে না।

বেশ! তাই হোক। দেখ, মনের মিলমিশ একই আছে। আর আমার মনে হয়েছিল, সুন্দ্রা মাঝি আমাদের বোকা ভাবছে, হাসছে।

না, তা ভাবিনি, পাহাড়িয়া-জঙ্গলিয়া লোক এ-ওর বিপদে হাসবে যখন, তখন হয় সর্বনাশ।

পাহাড়িয়া যুবক চারটি বাঁক আনল, চাল বহে নিল। তারপর দিন যায়, দিন যায়, তিলকা গেছে খাসজঙ্গলে। বড় দুষ্ট গাই একটা। ওইখানে গিয়ে বাছুর প্রসব করেছে। সামলে আনতে হবে। ঘাস এখানে মানুষ সমান। এ ঘাসের জান খুব শক্ত। শুকোয় যখন, তখন আঁটি বেঁধে বেঁধে ঘরে নিয়ে চাল ছেয়ে দাও, জল পড়বে না। এমন ঘাসে ডোরাকাটা বাঘ চলতে ভালবাসে। তাকে দেখা যায় না।

তুমি বাঘকে দেখ না, বাঘ তোমায় দেখে—কথা আছে। এমন জায়গায় এসে বাছুর বিয়ালে গাই-বাছুর ঘরে ফেরে? গাইচরী করছে এখন গ্রামের চার-পাঁচটি কিশোর। একজন তিলকাকে ডাকতে গিয়েছিল। অন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। এ গাইয়ের গুণ অনেক। প্রথম গুণ, চোখ এড়িয়ে দূরে দূরে চরা। দ্বিতীয় গুণ, বাছুর বিয়োলে দিন সাতেক তিলকা ছাড়া অন্য কেউ কাছে এলে শিং বাগিয়ে তেড়ে যাওয়া। দুষ্ট গাইটি সোমীর প্রিয়।

তিলকা বলতে বলতে আসছিল, গাইয়ের উদ্দেশে, বাঘের পেটে যাবে তুমি, তোমায় বাঁচাবে কে ? এবার চল ঘরে। লম্বা দড়িতে বেঁধে রাখব, ঘাস-বিচালি যা দেব খাবে।

হঠাৎ লম্বা ঘাস নড়ে উঠল। বাঘ নাকি ?

বাঘ নয়, মনসা পাহাড়িয়া। তার মাথায় এক ডোল। বড় ডোল। মনসা ডোলটি নিয়ে বেরিয়ে এল।

মনসা !

বাঘ ভেবেছিলি ?

এই ঘাসবন দিয়ে কেউ আসে ?

বাঘের ভয় নাইরে। নে।

কি ?

লবণ। সর্দার পাঠাল। চালের বদলে।

লবণ !

হ্যাঁ। কোম্পানির কারবার দেখলে তুই ক্ষেপে যেতিস। এখন বেচে টাকায় দু সের চাল। তাতে টাকার পাহাড় করে ফেলেছে। আড়তদারটা নিজেও কম টাকা করেনি। টাকা দিয়ে লবণ রে, গুড় রে, সব কিনে আনছে। মানুষ খাচ্ছে গাছের বাকল, লতাপাতা, সে নিজে এক আলাদা আড়তঘর তুলেছে। যত হাঁটি তত মড়া ডিঙাই। তা ধর্, সাত দশটা মড়া ডিঙালাম। কচি ছেলে মরে কাঠ। দেখে মাথায় আগুন জ্বলে গেল যেমন। সব নিয়ে এসেছি।

পাহারা ছিল না ?

আমাদের দেখে দৌড়। আড়তদারের নাচ কি ! লাফ মেরে মেরে নেচে নেচে বলে, সব নিস না বাপ। লাথ মেরে সরিয়ে দিলাম। তারপর কত চাল, কত ডাল, সব বয়ে বয়ে বিলালাম খানিক পথে, তা দিব কাকে ? মানুষ নাই গ্রামে। পাহাড়িয়া সমাজে বিলালাম। গ্রামের অবস্থা যদি দেখতিস।

তিলকা আস্তে বলল, আড়তটা জ্বালিয়ে দিলি না কেন? আড়তদার নিজে থাকত পিছনে, গোলদারকে আগিয়ে দিত।

বলল, তোরা ডাকাত হলি? বললাম, এখন আমাদের দেখ—আরো আসছে। কোম্পানির নাম করে কি বলতে গিয়েছিল, বললাম, ও নাম আর নয়, অনেক হয়েছে।

তিলকা গভীর দুঃখে বলল, যা করল কোম্পানি তাতে চাষীগেরস্ত চাষ করতে মন দেবে আর? মনে জানবে যত কষ্ট করি না কেন, ধান উঠলে জবরদস্তি কিনবে কোম্পানি।

চোখে দেখিস নি, ভাল আছিস তোরা।

চোখে না দেখলেও ভাল থাকা যাবে না আর, মনসার কথা শুনেই তিলকার মনে হয়েছিল হঠাৎ। মনসা চলে গিয়েছিল। হঠাৎ কেন যেন মনে হয়েছিল তিলকার, বিপদ আসছে, নিদারুণ বিপদ। বড় বিপন্ন মনে হয়েছিল নিজেকে। অথচ সবই তো তেমনি আছে, কিছুক্ষণ আগে যেমন ছিল। সেই বন, সেই দীঘল ঘাসের ঢেউ। মোষের গলায় ঘণ্টা বাজছে, বাতাসে বনশিউলির গন্ধ। মনসার জন্যে এই বিপন্নতার বোধ। বদলে গেছে, মনসা পাহাড়িয়া, বদলে গেছে পাহাড়িয়ারা। বঞ্চনায়, অবিচারে ওরা ক্ষেপে উঠেছে। এমনভাবে কথা বলল, মনসা, যেন ও কোনদিন লাঙল নিয়ে জমিতে নামেনি, যেন ও ছিন্নমূল। আজ মনসার, মনসাদের যে রূপান্তর ঘটছে, তেমন যদি তার হয়, তাদের হয়?

পথে পথে শব, গ্রাম নির্জন। কত মানুষ মরেছে? তিলকা গাইবাছুর নিয়ে, লবণের ডোল মাথায় ঘরের দিকে চলল। গাইচরী ছেলেদের বলল, এবার তোরাও ঘরে যা। ঘাসবনে বাঘের চলাফেরা বেশ।

গ্রামের কাছে এসে সামনে তাকাতেই দেখে রূপা। তিলকা বলল, ধর, লবণের ডোলটা ধর্। তোর লাজসরম নাই মোটে। ঘর ছেড়ে থাকতে পারিস না কেন?

থাকব বা কেন?

দুজনেই হাসল।

আর বিপদ এল।

একদিন পাহাড়িয়ারা মেরেছিল দিনমণি কামারকে। তাদের ভয় ছিল, দিনমণি ওদের আদিবাসী জীবনে বাইরের পৃথিবীকে ডেকে আনবে। কিন্তু মন্বন্তর শেষ হতে না হতে কোম্পানি সরকারের নজর পড়ল পাহাড়িয়াদের ওপর। না, বিদ্রোহ নয়। মন্বন্তরের পরেও চাই দুনো রাজস্ব। সুবা বাংলার তিন ভাগ মানুষের এক ভাগ না খেয়ে মরেছে? বাকি দু ভাগ দিক।

ফলে ফকির ও সন্ন্যাসীবিদ্রোহ নতুন করে ছড়াচ্ছে। বীরভূম-বাঁকুড়ায় চাষীরা হাতিয়ার তুলে রাজস্ব আদায়ে বাধা দিচ্ছে। মেদিনীপুরে লেগে আছে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ। পাহাড়িয়াদের এ বিদ্রোহ এখনি থামানো দরকার। "কোম্পানি" নাম শুনলেই তারা ক্ষেপে ওঠে।

মন্বন্তরের পরের বছর সুন্দ্রার ঘরে আসে নবজাতক। তিলকা ও রূপার ছেলে। আর সে ছেলের বয়েস যখন এক বছর, সেই ১৭৭২ সালে পাহাড়ের মাথায় মাথায় আগুন। ক্যাপটেন ব্রুক ভাগলপুরের সেনাছাউনিতে বসে বলে, পাহাড়িয়া? ওদের জব্দ করতে হবে? এ কি একটা কাজ হল?

অফিসার বলল, নিশ্চয়। পাহাড়িয়াদের দমন করা খুব দরকার। আমাকে একটা ছোট ফৌজ দিন।

একশো সেপাই এবং অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে রওনা হয়ে যায় ব্রুক জঙ্গল এলাকার দিকে। সমান জমিনের হাটে মোষ কিনতে গিয়ে তিলকা সে খবর পায় ও মনসাদের খবর দেয়। ফলে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলে।

আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে
সাহেব আসে ঘোড়ার পিঠে
খেরকাট খেরকাট খেরকাট।
আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে
সাহেব আসে ঘোড়ার পিঠে
খেরকাট খেরকাট খেরকাট।
সিপাইদের পায়ে পট্টি কোমরে পেটি
ঘেরকাট ঘেরকাট ঘেরকাট।
হো, তিলকা মুর্মু হো !
আমরা তীরের ফলা শানাই
হো, মনসা হো !
আমরা তোমাদের মেয়ে-শিশু আগলাই।
চেরকাট চেরকাট চেরকাট॥

পাহাড়িয়া পুরুষরা তীরের ফলায় শান দেয়। তিলকা-গোপী-চাঁদোরা নিয়ে আসে পাহাড়িয়া মেয়েছেলে বুড়োবুড়ি, শিশুদের।

তিলকা বলে, মনসা ! আমরা এসে যাই ? কি বলিস ?

না পারলে ডাকব। আগুন জ্বেলে দেব।

তিতাপানি নালার কাছে এসে ব্রুক ও তার সেপাইরা নালা পার হয়। হড়কা পাথর। বালি ও পাথর। জঙ্গল শুরু। এগোয়। আর হঠাৎ বেজে ওঠে পঞ্চাশটা নাগারা। ছুটে আসে তীর। সেপাই একশো। বন্দুক দশটি। তরোয়াল অনেক। ব্রুক গুলি ছোঁড়ে ও বলে, গুলি করো, গুলি করো।—গুলি খায় বেদিশা। তীর আসে বাতাস কেটে। সেপাই মরে। তীর পাঁজরে, তীর বুকে। তীরের ফলা ও লেজা ওজনে সমান। তাতে ভারসাম্য আসে। আর স্থির নিশানায় তীর ছুটে এলে তাকে এড়ানো খুব কঠিন। কয়েকজন সেপাই পড়ে যেতেই অন্যরা পালাতে থাকে। ব্রুক চেঁচায়, যে পালাবে তাকে গুলি করব। কিন্তু ব্রুকের ঘোড়ার পাঁজরে তীর।

যন্ত্রণায় হ্রেষারব করে ঘোড়া ছুটতে থাকে। এখন ব্রুকও নেই। ছত্রভঙ্গ সেপাইরা পালাতে চায়। জঙ্গল থেকে প্রবল জয়োল্লাসে চেঁচিয়ে পাহাড়িয়ারা বেরিয়ে আসে ধনুক তুলে! এরা এখন সেপাই নয়। ঘৃণিত "কোম্পানি" নামের প্রতিভূ একেকজন। কোনো দয়া নয়। খেরকাট, ঘেরকাট, চেরকাট। কয়েকজন সেপাই পালায়। তিতাপানি নালা লাল হয়ে বহে যায়।

তিতাপানির জল লালে লা—ল

তিতাপানির পাথর লালে লা—ল

তিতাপানির বালি লালে লা—ল॥

নাগারা বাজে।

পাহাড়িয়ারা বহুদিন বাদে যেন পবিত্র ও শুচি বোধ করে। হারানো গর্ব ফিরে পায়। আনন্দ আর উৎসব। সাঁওতালরা আসে। জঙ্গল এলাকায় আনন্দের বান ডাকে। মনসার বাবা সুন্দ্রাকে বলে বুঝি দুখের দিন কাটল।

সুন্দ্রা বলে, তা যদি বল, তবে একটা কথা বলি। এবার জোর দিয়ে চাষকাজে মন ফিরাও সমাজের। চাষকাজে মন ফিরলে সমাজটা বাঁধা থাকে। আমরা বুকে বল পাই।

আজ আনন্দ উৎসব। অনেক সহজে কথা বলা চলে। তিলকা মনসাকে বলে, এখন সাবধানের সময়। মার খেয়ে হেরে চলে গেল, ফিরে মারতে আসবে।

আবার মারব।

আমাদের ছেলেদের তীর মারতে, গুলতি ছুঁড়তে শিখাতে হবে ভাল করে। তীর খেলার পরব হত এক সময়ে। আবার ফিরাতে হবে পরব।

ফিরে মারবে ওরা?

ছেড়ে দেবে। এমন আকাল যারা বানায়, এমন আকালে মরা-শুকাভুখা মানুষের কাছে যারা খাজনা তোলে, তারা ভোলে না সহজে।

ভোলেনি ইংরেজ, ভোলেনি কিছুই। ১৭৭২ সালে এসেছিল ব্রুক। তখন থেকেই কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের নামে জমি নিয়ে জুয়াখেলা শুরু। আর শুরু বিদ্রোহ। বগড়িতে যত্নু সিংয়ের বিদ্রোহ, ঘাটশিলা-ধনাভূমগড়ে জগন্নাথ ধলের বিদ্রোহ, বরাভূমে পাইক সর্দারদের বিদ্রোহ, ময়ূরভঞ্জ ও পাতকুমে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ জঙ্গল মহালের দিকে দিকে। জমিদার যত্নু সিং যেমন বিদ্রোহী, তেমন বিদ্রোহী সাধারণ পাইক, তাদের সর্দাররা।

রাজমহালের জঙ্গল এলাকার তিলকারা এত কথা জানে নি। ১৭৭৪ সালে হয় বানবন্যা। খুব বৃষ্টি, খুব ঝড়। গাছ ভাঙে, পাথর গড়ায়, তিতাপানি আর ধারা, দুই নদী ফুলে ফেঁপে দু কুল ভাসায়। এমন ঝড় জলের রাতে রতনমণি কামারের ঘরের চালা ভাঙল। রতনরা এল তিলকাদের বাড়ি। ঝড়ের গর্জন যত, বাইরে শোনো পাহাড়ের ঢালে হাতির তীক্ষ্ণ ও আর্ত ডাক।

তিলকার মা সোমী বলল, সব ভাল রাখুক দেবতারা, পূজা দিব, পূজা দিব—পুত্রবধূকে বলল, তুই রূপা! এর মধ্যে ছেলে বিয়াস না মা। এতটুকু ধৈর্য ধর।

রূপা মাচাঙের নিচে গিয়ে শুল। ঝড় এসে থেকে ছুটোছুটি জিনিস টেনে ঘরে তোলা, তাতেই যেন তলপেটে আর শির দাঁড়ার নিচে ব্যথায় খিল ধরেছে।

রতনমণির বউ তেল গরম করে মালিশ করতে বসল রূপাকে। তিলকাদের থাকার ঘর দুটি। দুর্যোগে সবাই এক ঘরে এসে ঢুকেছে আজ।

কিছুক্ষণ বাদেই, সব চুপচাপ দেখে সোমী বলতে আরম্ভ করল, তিলকা যখন এতটুকু, গুঁড়াটা, তখন সে কি ঝড়, কি জল! কুর্খি ডাল তো তুলি নাই। ও মা! সকালে দেখি ডাল ভিজে জাব। আর গোহালের চাল উড়ে মাঠে যেয়ে বসে আছে।

সুন্দ্রা বলল, থাম দেখি, কাঁদে কে?

কে আবার কাঁদে, বাতাস কাঁদে। তখন ছেলে পিঠে বাঁধলাম আর উঠানে নামলাম—কে কাঁদে?

রতনমণির বউ বলল, দেওর বাইরে যাও। তিলকা যা। বেটাছেলে সবাই বেরোও গো। অ মেঝেন দিদি. নাম নাম, রূপার বুঝি ব্যথা উঠল।

আঁা? উঠল?

পুরুষরা বেরোয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ও দু হাতে কান চেপে বারান্দার ওপর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। বন্ধ ঘরে চকমকি ঠোকার শব্দ। বিদ্যুৎ চমকায়। একটা শেয়াল পালায় উঠোন দিয়ে। গোহালে গরুগুলি ডাকে ভয়ে।

সুন্দ্রা ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে হেঁকে বলে, গরু মোষ ওই ঘরে উঠাতে হয় রে তিলকা।

রতনমণি, তিলকা ও সুন্দ্রা দৌড়য়। ও ঘরে খড় গাদান্, ধানের ডোল, সুন্দ্রা ও সোমীর ঘর। গোহাল থেকে জলসিক্ত পশুগুলি তাড়িয়ে ও ঘরে তোলে। তারপর সবাই কানে আঙুল দেয়। বাজ পড়ে খুব কাছে।

রতনমণি বলে, এ কি দুর্যোগ বাবা। এটি হল কুমোর বুড়ির জন্যে। জল নেই চাষ হবে না—বর্ষা হয় না, ধান শুকাবে খুব ইঁদ রাজাকে ডাকাডাকি। বুড়ি সমানে বেরতো করে, পিঁড়ি দেয় বসতে। তাতেই ইঁদ রাজা মনের সুখে জল ঢালছে।

এ কি দুর্যোগ!

সুন্দ্রা বলে, তিতাপনি আর ধারা এখানে তো জায়গা পাবে না। নিচে নেমে সব ভাসাবে।

তিলকা বলে, পাহাড়িয়া গ্রাম বুঝি গেল।

কথায়-বার্তায় সময় যায়। ঝড়ের দাপট কমে। ভোর হয় যখন তখন বৃষ্টি চলছে। দরজা খোলে সোমী। ডেকে বলে, মেয়ে হল গো, খু—ব দলমলে মেয়ে। মায়ের মত।

রোদ ওঠে অনেক বেলায়। তিলকার কোমর ফেটে যায় উঠোন থেকে গাছের পাতা ও ডাল সরাতে, গরু বার করতে। সোমী, রতনমণির বউয়ের নির্দেশে কালোজিরে, মরিচ বাটে। গরম ভাতে সে বাটা মেখে খায় রূপা, ঘুমোয়। সুন্দ্রা খবর দেয় পুরোহিত, নায়েককে। জন্মাশৌচ সকল গ্রামের। নায়কে স্নান করলে সবাই শুদ্ধ। বিকেল নাগাদ খটখটে রোদ। কে বলবে দুদিন ধরে প্রলয় চলেছিল। তিলকা রূপার খোঁজ নিতে সময় পায়নি। সোমীর কাজ ছিল অফুরান। আজ আর গাঁপড়শির সাহায্য পাবার দিন নয়। সকলের ঘরই ছত্রখান হয়ে আছে।

বিকেলে তিলকা বলল, আয়ু, ধান-কলাই কাল রোদে দিস। আমি ডোল বহে দেব।

নে, ছেলেটা ধর।

ছেলে নিয়ে তিলকা ঘরের দোরে দাঁড়াল। রূপা মেয়ে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। তিলকা সারাদিন কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিল, রূপা মনে জেনেছে। রূপা, যদি আজ ঘরে আটক না থাকত, সোমীর সঙ্গে দৌড়দৌড়ি করে কাজ করত সে। মেয়ে! তিলকার মন ভরে যায় সুখে।

মেয়ে হতে না হতে রূপা আবার মা হয়। বড়ই আশ্চর্য সে কাহিনী।

এই বানবন্যা দুর্যোগের পর চাপ্তি ধানুকদের ঘর থেকে কান্না ওঠে। তারা এসেছিল ছয় সাত ঘর। হাট ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন রাস্তা, গঞ্জ, এ সব কাছে পাঁচ মাইলের মধ্যে পাবার জন্য তারা ক্রমে চলে যায় আড়াবুরু গ্রামে। শুধু মঙ্গল ও তার বউ রাধি যায়নি। রাধি এই দুর্যোগের সময়ে চার দিনের ছেলে নিয়ে শুয়েছিল, তিন বছরের মেয়ে ও মঙ্গল ছিল দাওয়াতে। এমন কথা কে কবে শুনেছে, গাছ পড়ে সে ঘর ভাঙল আর মরল মঙ্গল আর রাধি, দুটো ছেলে মেয়ে রইল বেঁচে? মঙ্গলের মা ছিল খোঁয়াড়ে। শুওর, ছাগল

নিয়ে। তার কান্নায় আকাশ চিরে গেল। কান্নাকাটি থামতে তখন সমস্যা কচি ছেলে বাঁচে কি করে? গ্রামে কার কোলে কচি ছেলে? কার বুকে দুধ? সোমী নিয়ে এল রাধির ছেলে আর মেয়ে। আসার পথে গালাগাল দিতে দিতে এল।

কচি ছেলে, কচি মেয়ে। তা কামার নেবে না, কুমোর নেবে না, ওদের জাতের নয় বলে? এ কি কথা মা? এ কি সমাজ? আমি নিলাম। হ্যাঁ আমার বউয়ের বুকে দুধ, আমার ঘরে আরেকটা ছেলে। নে রূপা, দুধ দে। মরে যায় গো!

রূপা তখনি দুধ দিল। রাধির ছেলে "মা মা" বলে খানিক কাঁদল। তারপর দুধ খেল বাটিতে, ঘুমোল।

তিলকা আর রূপা হেসে বাঁচে না। ছিল দুটি ছেলে মেয়ে, হল চারটে। মঙ্গলের মা তিন দিন ওদের উঠোনে বসে রইল। তারপর বলল আড়াবুরু যাই সেঝান্ দিদি গো!

কেন, কি হল?

বেটার, বউয়ের শ্রাদ্ধ আছে।

এখানে হয় না?

এখানে? না গো দিদি। সেথা জাতের মানুষ আছে, তারা যা করে, যা বলে?

তবে যা। আসবি কবে?

এই ঘুরে আসব।

যাবার কালে শুওর আর ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে গেল বুড়ি। এগুলো বেচে শ্রাদ্ধশান্তি করবে। সেই যে গেল, আর সে এল না। তো এলই না। যেন উপে গেল মানুষটা।

তিলকা পরে খবর আনল। হ্যাঁ, গিয়েছিল বুড়ি সে গ্রামে। শুওর আর ছাগলের বদলে শ্রাদ্ধশান্তি করে দিয়েছিল তার সমাজ। তারপর বলেছিল ছেলে মেয়ে আনো, আমরা পালপোষ করে দেব। তারা বিপদে দেখেছে, মানুষের কাজ করেছে। এখন পিতামহীর কাজ করো।

এই আনি !—বলে বুড়ি সেখান থেকেও রওনা দেয়। না, বাঘে তাকে খায়নি। সে গেছে গ্রামের দিকে। সমতলের গ্রামে। ছেলে নেই, ছেলের ছেলেমেয়েদের ভাবনা সে ভাবতে পারবে না। ভিক্ষে করে খাবে। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

শুনে তিলকা বিশেষ বিচলিত হয়নি। চাঞ্চিধানুকদের একজন বলেছে, যেয়ে নিয়ে আসব ওদের ?

কেন ?

তাই অনেকদিন রাখলি।

আমার কথা ভাবতে বলেছি ?

না, তা নয়—

ওরা জানে না বাপ মা, আমাদের জানে।

তা ভাল, আর হাতে ধনুকটা ধরাতে হয় যখন—যেমন আমার ছেলে ধরে, তেমন ধরবে।

মেয়েটা ?

আমার মেয়ের মত বিহা দিব।

তোর আশ্রয়, বটগাছের আশ্রয়।

তিলকার রক্তের ছেলের নাম সোমা, পাওয়া ছেলের নাম বুধা। রক্তের মেয়ের নাম গিরি, পাওয়া মেয়ের নাম মতি। চারটি ছেলে-মেয়ে থাকার সুবিধে অনেক। নিজেরা খেলে বেড়ায়। সুন্দ্রার আর সোমীর এখন ভরা সংসার।

তিলকা আর রূপা এখন দশ হাতে খাটে। মাঠে যায় দুজনে, শিকারে যায় তিলকা। তিতাপানিতে মাছ ধরে রূপা, ধান কাটে দুজনে. তিলকার জীবনে এমন পরিপূর্ণতার সময় আর আসেনি !

সমাজটি বেঁধে রাখার জন্যে তবু তিলকার মনে থাকে ব্যাকুলতা। সুন্দ্রাকে বলে, শিকারপরবে কথাটা উঠাব। মাঝি গ্রামের তুই। বল হাটে যে চালের দাম কিনতে বেশি। বেচতে কম, সে ফাদে পা দিবেন কেউ।

বলব।

হাটে নতুন গোলদার বলে, টাকা দিয়ে জিনিস কেন। আমরা কিনব না পয়সা দিয়ে। আমরা দিব ধান-চাল, যা দিয়েছি এতকাল। বলে. এ নিয়ম উঠে যাবে।

বলে ?

হ্যাঁ আপুং বলে। তখন বলি, আমার নাম তিলকা মুমু হে। আমি কে, সকলকে শুধাও।

চোট আসবে একটা।

বলে, নিষ্কর জমিতে খাজনা ধরেছিল কোম্পানি. তাতে দিকে দিকে জঙ্গলমহলে লড়াই চলে।

কোথায় ?

অনেক জায়গায়। বলে, তোদের মত লোক যদি কোম্পানির সেপাই হয়, টাকা পায়, দাম পায়। আমরা মানি না সে কথা। দেখাই যাক না, জুলুম উঠাব না।

সুন্দ্রা বলল, তুই মাঝি হ। আমার দিন নাই আর। এত কথা ভাবি নাই কখনো। জঙ্গলআবাদী জমিতে বাস, জমিতে চাষ। পূজাপরব দেখব, সমাজের ভালমন্দ দেখব, আমার চক্ষু গ্রামে বাঁধা থাকে। তোর চক্ষু, তোর মন সমাজের কথা ভাবে।

না, আপুং, না! তুই থাকতে না।

তিলকা, তিলকা আমার! তুই দেখেছিলি স্বপ্নে সেই আদি আয়ু রাজহাঁসী। আমি দেখি নাই। সে রাজহাঁসী ঠাঁই না পেয়ে, ঠাঁই না পেয়ে তোর বুকে বসেছিল, মোর বুকে বসে নাই। সে কথা আমি ভুলি না।

তিলকা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তিলকা! হাটে আমিও যাই। আমাকে বলে সেপাই হও তোমরা। তোকে বলে। সেপাই হতে পারে না সাঁওতাল। সেপাই হব? হয়ে সাঁওতাল পাহাড়িয়া চাঞ্চিধানুক মারব ?

তাই বলেছি আপুং।

সাঁওতালরা হয়নি সেপাই, পাহাড়িয়ারা হল। বড় দুঃখের সে কাহিনী। সে কথা মনে পড়লে তিতাপানি নদীর জল আথিপিথি ধায়, গাছের পাতা দুঃখে ঝরে, প্রান্তরে কান্তারে বাতাস হা হা বহে যায় বেউদ্দিশা।

আর তিলকার বুক ফেটে গেল।

॥ ৬ ॥

১৭৭১ সালে এসেছিল ক্যাপ্টেন ব্রুক।

১৭৭৩ সালে রাজমহল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট হয় অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড। ১৭৭৩ সাল থেকেই ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের ব্যাপার নজরে রাখছিল। ১৭৭৫ সালে সে ভাগলপুরের কলেক্টরকে বলেছিল, মেদিনীপুর ও অন্যত্র জমিদাররা পাইক ও চুয়াড়দের কি করে বশ করেছে তা দেখার মত ব্যাপার।

কি করে?

ফৌজে নিয়ে, নিষ্কর জমি দিয়ে।

ফৌজে নেবে কাকে? শুধু কি পাহাড়িয়া? সাঁওতালরা আছে। তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা অনেক সংঘবদ্ধ। ১৭৬৯ সালে আমরা সকলের কাছে ধান-চাল কিনেছি। পাহাড়িয়াদের কাছেও। সাঁওতালরা বেচেনি। প্রথম দিকে কিছু বেচল। তারপর বন্ধ করে দেয়।

পাহাড়িয়া আর সাঁওতালরা কি বন্ধু?

গভীর সমঝোতা ওদের মধ্যে।

সেটা ভাঙতে হবে।

কে ভাঙবে?

আমরা।

আমরা ওদের দুশমন।

ওরা বলে "দুশমন", এই তো? তাতে কি? বন্ধু হতে হবে ওদের। ওদের বৈশিষ্ট্য হল সরলতা, মানুষকে বিশ্বাস করা ওদের স্বভাব। তার সুযোগ নিতে হবে।

নিয়ে কি করবে?

পাহাড়িয়ারা সংখ্যায় কম। বাগ মানানো সোজা।

বাগ মানবে?

দেখা যাক।

১৭৭৯ সালে ক্লিভল্যাণ্ড ভাগলপুরের কলেক্টর। ক্লিভল্যাণ্ড যে কলেক্টর হল, তা ঢোল শোহরতে জানানো হল। পাহাড়িয়া সর্দারদের কাছে গেল সাহেব সর্দারের নজরানা। বড় খাসি, সরু চাল, ঘি। পাহাড়িয়ারা খুবই অবাক। বাহকদের মারা চলে না। হাতিয়ার আনেনি, ভেট এনেছে, সাহেব সর্দারের ভেট।

তারপর এল ক্লিভল্যাণ্ড নিজে। বলল, হাতিয়ার আনি নি। কথা বলতে এসেছি। অনেক অবিচার করেছে কোম্পানির আগের লোকগুলো। চাল কিনেছে কম দামে, বেচেছে বেশি দামে। এ স—ব করেছে নিজেরা, আর কোম্পানির নামে চালিয়েছে। কলকাতায় বসে কোম্পানি সব জেনে গেছে। তাতেই তো আমি এলাম। হ্যাঁ, বছরে দু বার সর্দারদের নিয়ে বৈঠকে বসব। সব অভাব অভিযোগের কথা শুনব। আমি তোদের বন্ধু।

বেজায় বন্ধু কলেক্টর ক্লিভল্যাণ্ড। পাহাড়িয়ারা নাম দিল চিলি-মিলি সাহেব। চিলিমিলি সাহেব বৈঠক করে। চিলিমিলি সাহেব আসে। পুজাপরবে।

তিলকা বলল, এত ভাল ভাল নয় মনসা।

না না, এ খুব ভাল।

এই ভাল সাহেব পাহাড়িয়াদের বন্ধু সেজে ঢুকল জঙ্গলএলাকায়

আর পাহাড়িয়াদের কাছে গল্পে গল্পে জেনে নিল সাঁওতাল সমাজের কথা।

তারপর বলল, তোদের মত বীর কে? হ্যাঁ সেপাই হলে তোদের লড়াই করার এলেম সবাই জানত।

আজ কথা, কাল কাজ। কোম্পানির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে পাহাড়িয়া সর্দাররা পেল মাসে দশ টাকার প্রতিশ্রুতি। পাহাড়িয়া মাঝিরা পেল দু টাকা বেতন, নীল জামা, লাল পাগড়ি। চারশো পাহাড়িয়া কোম্পানি ফৌজে নাম লেখাল।

সেদিন পাহাড়িয়া গ্রামে গ্রামে উৎসব। সুন্দ্রা বলল, মরণের নাগরাটা বাজে রে তিলকা।

এ কথা বলল সুন্দ্রা বিছানায় শুয়ে। জ্বর হয়েছিল তার। জ্বর সামান্যই, কিন্তু পাহাড়িয়ারা কোম্পানির বন্ধু হয়ে গেল, সেপাই হতে স্বীকার করল, এতেই যেন সুন্দ্রা ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেল।

সব দেখতে পাচ্ছি আমি,—সে আচ্ছন্ন গলায় বলল!

কি দেখিস আপুং?

সব অন্ধকার, ধোঁয়া ধোঁয়া, আঁধির আকাশ।

আর কি?

তুই এ জঙ্গলএলাকা মাথায় ধরে হাঁটতেছিস। তোর মাথার উপর জঙ্গল-খেত-অগণন মানুষ।

আর কি?

সেই প্রথম আয়ু রাজহাঁসী তোর মাথার উপর।

সোমী চোখ মুছে তিলকাকে বলল, নায়কেকে খবর দে। পূজার ব্যবস্থা করে দে। জাহের-থানে যাব আমি।

জাহের-থানে পুজো হল। কার্তিকে ধানক্ষেত পূর্ণগর্ভা। তিলকার ছেলেমেয়েরা সকল ছেলেমেয়ের সাথে খেত থেকে পাখপাখালি তাড়ায়, কেবল তাড়ায়।

গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে, তিলকাকে মাঝি করে দিয়ে, গ্রাম-

সমাজের ভার তিলকার উপর দিয়ে সজ্ঞানে চোখ বুঝল সুন্দ্রা। বলে গেল, নীল জামা নীল পাগড়ি পরিস না তোরা। কোম্পানি চোট দিবে, তিলকার কথা শুনিস।

সুন্দ্রার মৃত্যুতে গ্রাম ভেঙে পড়ল। কামার-কুমোর সব জাতের ও বৃত্তির মানুষ কাঁদল। সুন্দ্রার মৃত্যু মানে প্রাচীন যুগের শেষ। কিন্তু তখনো তিলকা সে কথা জানে না।

ক' দিন বাদে এল মনসা ও তার বাবা। সর্দারের গলায় ছিল অভিযোগ ও বেদনা। সুন্দ্রা চলে গেল, আমি জানলাম না।

কয়েক দিন ধরে অগণিত মানুষ এসেছে খবর নিতে। তিলকা শ্রান্ত, মন তার বিমূঢ় এখনো।

জানাই নি, জানবার কথা তো নয়।

আমার সময়ের মানুষ, আমার মানখাতিরের মানুষ, সে মানুষ চলে গেল আজ। সমাজের সকল সুখে দুখে তাকে পেয়েছি। বয়সে সে ছোটই হবে কিছু. কিন্তু বুদ্ধি বলো, মন বলো সকল দিকে রাজা। কত ভাবে যে সামলে নিয়েছে ঝড়ঝাপট কি বলি! সেদিনও বলে এসেছে, চাষেবাসে মন ফিরাও সমাজের, চাষেবাসে বাঁধা থাকে সমাজ। সমাজের সুদিন এল গো, চিলিমিলি সাহেব অনেক করল আমাদের জন্যে। কিন্তু সে কথা তাকে কব, কাছে বসব, সে ফুরসত আমায় সুন্দ্রা মুমু´ দিল না।

উঠোনে, দাওয়ায় যত সাঁওতাল বসেছিল, মানীগুণী মানুষ সব, কে মাঝি, কে দেশমাঝি, কে পরগনাইত, একসঙ্গে চাইল পাহাড়িয়া সর্দারের দিকে, তারপর তিলকার দিকে। তিলকা দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে উদাস, কান্নালাল চোখে বসে আছে রতনমণি। প্রত্যেকের মনে একটিই কথা। কিন্তু রুক্ষ চুল, গম্ভীর ও স্তব্ধ তিলকা সকলের দিকে চায়। তারপর বলে, আমরা অশুচ এখন! তেলনাহানও হয় নাই। কে কারে খবর দেয়। আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে গেছে, পায়ের তলা হতে জমিন।

তা বটে, তা বটে। আরো কিছু দুঃখ করে পাহাড়িয়া সর্দার। সে দুঃখ আন্তরিক। সে বোঝে না সাঁওতালরা তাকে ও তার ছেলের নীল জামা, লাল পাগড়িকে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছে। মনসা বোঝে। ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে অপলক তিলকার দিকে। সে বুঝেছে। কেন এ নীরব ধিক্কার তাও বুঝেছে। আজ কথাটি ফয়সালা করার দিন নয়। সে বলে, চল বাবা, এখন এদের কাজকামের সময়। তিলকা, যা দরকার মনে করিস বলিস। সমাজ বলতে আমরা আর তোরা, এ কথা তোর কাছে শুনেছি কতবার, মাঝির কাছে শুনেছি।

বলব।

তিলকা বলে, তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে আহত ও ক্ষুণ্ণ হাসি। মনসারা চলে যায়।

যদু পরগনাইত বলে, কোম্পানির পোশাকটা বড় ভাল লেগেছে। গায়ে জামা উঠল তো খোলে না আর।

তিলকা বলে, হ্যাঁ নীল জামা, লাল পাগড়ি।

কয়েকদিন কেটে যায়। ক্রমে কাটে কয়েক মাস। বাবা না থাকার বেদনা তিলকা সঞ্চার করে দেয় সকল কাজে। গভীর দায়িত্ব তার মনে। বাবা বলেছিল, সব অন্ধকার, ধোঁয়া বর্ণ, আঁধির আকাশ। তিলকা তার মধ্যে দু হাতে জঙ্গল এলাকাটি ধরে হাঁটছে—জঙ্গল-খেত-অগণন মানুষ—মাথার উপর উড়ে চলেছে সেই আদি জননী রাজহংসী। কেন বলেছিল বাবা? তবে কি জঙ্গলের স্নেহভরা কোল ছেড়ে আবার যাযাবর হয়ে যাবে সাঁওতালরা?

কোথায় যাবে সাঁওতালরা? কোন আঁধি আসছে যার প্রচণ্ডতায় ভেঙে পড়বে অরণ্যের আশ্রয়, ধানক্ষেতের আশ্বাস, শিকারের আশ্রয়?

আহিড়িপিড়ি থেকে শশাংবেড়া—

শশাংবেড়া থেকে জাপি—

জাপি থেকে আহিরি—

তারপর কেন্‌থি, ছাই—

তারপর চাম্পা—

তারপর সাওন্ত—

আদিজননী সে আদিম রাজহংসীর ডানায় কোন আঁধির ঝাপটা লাগবে? সাঁওতাল সমাজকে মাথার উপর ধরে কোথায় যাবে তিলকা?

আপুং, আপুং আমার—তোমাকে যে আমি এই ধানের গন্ধে, শিকারের সুখে, তুষের আগুনের ওম্ পোহানোতে, ছেলেমেয়ের মকাই সেঁকে খাওয়ার আনন্দে, মায়ের দুঃখগভীর কালো চোখে, রূপার মমতামাখা বুকে, সব কিছুতে পাই।

এ তুমি কি দেখে গেলে? পাহাড়িয়াদের জিতে নিল কোম্পানি ছলনা করে, তাতেই কি তুমি ভবিষ্যৎ দেখেছিলে?

বন থেকে খামআলু তুলে ঘাড়ে করে আনছিল তিলকা আর ভাবছিল এই সব কথা।

হো, তিলকা হো!

মনসা পাহাড়িয়া। খালি গা, খাটো ধুতি, তীরের ডগায় বিঁধানো সাপ। ছুঁড়ে ফেলল সাপটি মনসা, লেজ ধরে আছাড় মারল। মরে গেছে এখন। মনসা সামনে এল।

কি, মনসা?

তিলকা, খুব দরকারি কথা।

আমার সাথে? তোদের সকল দরকার তো এখন কোম্পানি দেখে। আমি তোর কোন্ দরকারে লাগব?

শতবার বল্, মেনে নেব। বলতে দিবি না কিছু?

কি বলব? পাহাড়িয়া স্বাধীন, পাহাড়িয়া লড়াকু, পাহাড়িয়া গরব আমাদের। সে সুখ, সে গরব মুছে নিলি কেন? নীল জামা, লাল পাগড়ি, কোম্পানির সেপাই! একদিন সেপাই তোদের মারতে আসে, তোরা তাদের মারলি। আজ তোরা সেপাই হয়ে তো আর

সমাজের মানুষ মারবি না, আমাদের মত মানুষ মারবি। চাঞ্চি-ধানুক মারবি।

বল্, বল্ তুই।

কোম্পানি যাকে বলবে তাকে মারতে হবে।

মনসা নিরানন্দ হাসল। বলল, আমি এত কথা জানি না। বলতে এলাম, কোম্পানি জবর খেলা খেলেছিল। আগে চিলিমিলি সাহেব বন্ধু সাজল। তা বাদে টাকা আর জামা-পাগড়ি আর সেপাইয়ের কাজ দিয়ে আমাদের আলাদা করে নিল তোদের থেকে। তারপর যারা সেপাই হল, তারা কোথা গেল জানি না।

দূরে কোথাও গেছে বুঝি বা! আগে ভাবতাম মনসা, ধরতি বলতে বুঝায় এই জঙ্গলএলাকা। তখন জানি নাই, এখন জানি, ধরতি অনেক বড়। এত বড় ধরতি, কোথায় গেছে তারা, কাদের বা মারছে, কোম্পানি সেপাই হয় তারা।

আরো কথা আছে। তোদের বসতি নিচে। চিলিমিলি সাহেব বলে, সেই ইলাকার নাম দিবে দামিন-ই-কোহ্। যা যা বলেছে, সব বলি, দাঁড়া। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের কতক জায়গা নিবে এর মাঝে। রাজমহলের পশ্চিমের জঙ্গল আবাদী করে নিতে বলবে। আমাদের সেখানে যেতে বলে এই এক কথা। আমরা এ কথায় বলে দিয়েছি, সাঁওতাল গ্রামবসতির সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই আমাদের। পাহাড়ের ঢাল ছেড়ে নিচে নামব না, দামিন-ই-কোহ্ যাব না।

আর কি কথা?

তখন টোপ ফেলে। দামিন-ই-কোহ্ গেলে পাহাড়িয়া খাজনা দিবে না। কিন্তু সাঁওতাল গ্রাম হতে খাজনা নিবেই নিবে এবার। আর ছাড়বে না।

আরো কথা আছে?

সকল কথা শুনলে আরো পাহাড়িয়াকে সেপাই করে নিবে।

কত লোভ দেখাল কি বলি। সাঁওতালরা মন্দ, তারা বিবাদ উঠায়, তাদের বুদ্ধিতে আমরা কোম্পানির সঙ্গে বিবাদ করি।

তুই কি বললি? তোরা সবাই কি বললি?

বাবা আর সকল সর্দার এখন বুঝছে। তারা বলে, যে যারা সেপাই হল, তাদের তো নাগাল পাব না। কিন্তু টাকা নিব না আর, জামা পাগড়ি ফিরিয়ে দেব।

দিয়েছে?

দিয়েছে।

সব করলি মনসা, আগে করলি না? জঙ্গল এলাকায় কোম্পানি ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তোদের হারানো বুদ্ধি ফিরে এল? এ কি হল, এখন কি হবে?

তারা ফৌজ এনে জুলুমে খাজনা নিবে।

তোরা কি করবি?

অন্যদের কথা জানি না। আমি কাঁড়ের ফলায় শান দিব। আমি দিব, মধু দিবে, মহন দিবে।

তখনো মনসা জানে না, তিলকা জানে না, কত জটিল হয়ে উঠবে সব। তাদের জীবন চলে সরলরেখায়। কিন্তু কোম্পানি সে জীবন থাকতে দেবে না। গ্রামীন জীবন, আদিবাসী জীবন, সব জীবনের আদল ভেঙে দেবে এখন। ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শিল্প। ভারতের গ্রামীন সমাজ ভেঙে দিয়ে প্রতি ধানের চারার গোড়ায় শোষণের শিকড় চালাবে ইংরেজ। তার চাই কাঁচা মাল। ইংরেজের এ কাজে সহায় হবে নতুন পত্তনি জমিদার-আমলা-মহাজন। কিছুই জানেনি তিলকা ও মনসা। তাদের চারিদিকে পাতা ঝরছিল শীতের বাতাসে, কাঠবিড়ালি দৌড়ে যাচ্ছিল, আর ঝাঁকে ঝাঁকে যাযাবর পাখি ডানায় ছুরিতে বাতাস চিরে চলে যাচ্ছিল ভাগীরথীর চরের দিকে। ওরা এক ভাবে আসে, এক পথে চলে, প্রতি বছর।

তখনো মনসা জানে না, তিলকা জানে না, আজ যে পাহাড়িয়ারা সাঁওতাল সমাজের বুকে ঘা দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মিতালি করেছে, তারা ১৭৮৯ সালে, ঠিক নয় বছর বাদে বিদ্রোহ করবে কোম্পানির বিরুদ্ধে। আবার ১৮৫৫-৫৬ সালে কিছু পাহাড়িয়া সৈন্যসেপাই কোম্পানির হয়ে লড়তে আসবে সাঁওতালদের সঙ্গে, আর বাতাসে গুলি ছুঁড়ে সরে যাবে।

কিছুই জানেনি মনসা আর তিলকা।

মনসা বলল, কাঁড় শান দিব।

তিলকা বলল, দিয়ে?

মনসা বলল, তোর কাছে চলে আসব।

তিলকা বলল, তাই হোক, তাই হোক।

তুই কি করবি?

গিরা দিই, সকল কথা সমাজকে জানাই। তুই যা ব'লস সব বলব।

গিরা পাঠিয়েছিল তিলকা মাঝি। ১৭৮০ সাল আসে আসে। তিতাপানি নালার গতিপথে মস্ত পাথরের প্রান্তর। তিলকা মাঝি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি নই দেশমাঝি, নই পরগনাইত তবু গিরা দিলাম। আমার স্বপনে সে প্রথম আয়ু বার বার আসে, বুকে বসে। তাতেই বুকে বল পেলাম। বড় বিপদ আমাদের, বড় দুর্দিন। কোম্পনি জোর জুলুমে বাধ্য করাবে আমাদের, কোমর ভেঙে দিবে আমাদের। তাতেই এখন খাজনা উঠাতে চায়। খাজনা দাও, তুমি এখন কোম্পানির প্রজা।

যাদু পরগনাইত উঠে দাঁড়াল। বলল, প্রজা? প্রজা আমরা হই না কারো। রাজা আসে, রাজা যায়। কেউ কোনোদিন খাজনা নিল না। নেবে বা কেন? অজগর জঙ্গল কেটে হাসিলী জমি। কেউ এমন নাই যে একা নিল একশো কুড়া, অন্যরা উপোসে মরুক।

না, খাজনা নেয়নি। মনসার কথা শুনে আমি চলে যাই শ্যাম সিং ঘাটোয়ালের কাছে। সে জানবে। সে জঙ্গল এলাকায় ঢোকার পথ আগলায়। শ্যাম সিং বলল, কোম্পানির সদর ঠাঁই কলকাতা। কোম্পানি খাজনা-খাজনা বলে পাগল হয়েছে। এই ঘাটোয়াল আমার চেনা লোক। সে আরো বলল, এখন কি নতুন বন্দোবস্ত হয়েছে খাজনা নেবার। তার নাম দশসালা বন্দোবস্ত। এখন কোম্পানি নিষাস খাজনা উঠাবে জুলুমে। সমাজের সবাই আছ, তোমরা বল। খাজনা দেবে? প্রজা হবে কোম্পানির? ভেবে চিন্তে বল হে।

মহর উঠে দাঁড়াল। এখন সে নয় শ্বশুর, তিলকা নয় জামাই। এ অন্য জায়গা। অন্য সম্পর্ক। মহর ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, মাঝি! তিলকা মাঝি! এটা তুমি কি বললে? এ কথা বলার জন্যে শাল হালের গিরা পাঠিয়েছিলে? কোন্ সাঁওতাল "হ্যাঁ" বলবে? আমাকে তো শুধাতে হবে।

আমি বলি "না"। দিব না খাজনা।

আমরাও দিব না। না, দিব না।

তাহলে চোট আসবে।

আসলে লড়ব।

কে লড়াই চালাবার ভার নিবে?

তুমি নিবে। তিলকা মাঝি নও তুমি আর, তোমাকে আমি নাম দিলাম বাবা তিলকা মাঝি। তুমি নিবে ভার। তোমার স্বপনে আসে প্রথম আয়ু, তোমার বুকে বসে। কেন? সে জেনে যায় কখন পিলচু হাড়াম-পিলচু বুড়ির সন্তানদের কপালে দুঃখ আসে। তখন, হ্যাঁ, তখন সে স্বপন দেখায়।

বেশ! স্বীকার হলাম। তবে চোট আসলে লড়তে হবে। তীরের ফলা বানাও, গুলতি বাঁটুলও আমাদের জবর হাতিয়ার।

ঘরে ফিরতে রাত হয়েছিল তিলকার। ঘুম আসতে ভোর। সকালে দেখছিল রূপা তার দিকে চেয়ে বসে আছে।

কেন রূপা, কেন ?

দেখে নিই।

দেখিস নি আগে ?

বাবা তিলকা মাঝিকে দেখিনি।

দুঃখের দিন আসছে।

হ্যাঁ।

খেত উঠা পরব, মা-মাড়ে পরবের দিন হয় এটা। গোত্-মাঘের দিন আসে। সকল পূজাপরব মাথায় উঠাল কোম্পানি। পৌষ মাসের শেষ দিনে করি বেঝা-তুন্। তীরের নিশানা বিঁধি। বেঝা-তুন্ এখন চলল।

উঠল নাচ-গান। টামাক, টুম-ডাক, তিরিও, বানাম, বুয়াং—সকল বাদ্যবাজনা থাকল তোলা। নাগারা বাজবে, গিরা যাবে, লড়াই করবে, আপুং ভাল সময়ে মরেছে।

সে জেনে গেছে সব, বলে গেছে।

জানি। চোখে ত দেখে যায়নি। নিশ্বাস ফেলে রূপা বলল, যাই, কাজে যাই। আজ মনে নেয়, তোর কাছে থাকি, কাজে যাব না।

শাশুড়ির সঙ্গে ধান কুটতে কুটতে রূপা নীরবে কাঁদতে লাগল।

সোমী শুকনো, গম্ভীর গলায় বলল, ধান কুটতে কাঁদে যে তার দুঃখ ঘোচে না।

ভয় করছে আমার।

আমার করছে না ? স্বামী নেই, ছেলে যায়—

আয়ু! কি বলিস ?

বুকের ভিতর রক্তে জানছি রে রূপা।

ওকে নিষেধ কর।

না। ওর উপর সকল গ্রামের সকল সমাজের ভার। নিষেধ

করব না, কাঁড়ে শান দিয়ে দিব, লড়াইয়ে পাঠাব, পূজা দিয়ে ঘরে-খেতে খাটব আর কাঁদব। তুই, আর আমি।

হ্যাঁ আয়ু।

নে, তুই ধান কোট। আমি পাক করি। মতি কোথা, জল আনুক। সোমা রে, লাকড়ি আন্।

ধান কেটে নেবার পর তিন মাসও কাটল না। জঙ্গলের প্রান্তে প্রান্তে ঢোল সোহরত পড়ল। কোম্পানির তহশিলদার আসছে পাইক বরকন্দাজ নিয়ে। হাল বাকি নেবে, নেবে হাল পাওনা।

হাল বাকি কি?

ফসল তো এর আগেই তুলেছ একটা। তার খাজনা বাকি রেখেছ না? সত্য সত্য খাজনা বাকি পড়লে তা হয় হাল বাকি। হাল বাকি দাও, দাও হাল পাওনা।

হাল পাওনা কি?

যে ফসল তুলবে তার খাজনা।

খাজনা কত করে?

আমন ধানের জমিতে বিঘা প্রতি ছয় আনা। রবি খন্দের জমিতে তিন আনা।

এক জমিতে যে আমন আর রবিখন্দ করছে?

আমনের দরুন ছয়আনা, রবির দরুন তিন আনা দেবে সে। হিসেব সিধা।

জমি তো একটাই।

ফসল যে তুটো।

যে দেবে না, তার কি হবে?

কোম্পানি তাকে মামাবাড়ি দেখাবে।

প্রথমে ঢোলসোহরত। তারপর পাইকপেয়াদা নিয়ে তহসিলদার। তার

মাথায় পাগ ফরফর
পায়ে জুতা মচ মচ
কানে কলম কানের শোভা
চোখ ঘুরে বন বন
ধান-চাল-গরু-মোষ দেখে নেয়
আর খাজনা ধরে ॥

খাজনাই জুলুমের প্রথম বলি পিপল গ্রাম। জঙ্গল এলাকার সীমান্তের এ গ্রামে তহসিলদার ঢুকতে পায়নি। পরে যে সঙ্গে সে আনবে সেপাই, তা সাঁওতালরা বোঝেনি। কিন্তু সেপাই এসেছিল, সঙ্গে ছিল তহসিলদার। দশ ঘর সাঁওতালের গ্রাম ঘিরে ফেলে তারা। গুলি ছুঁড়ে কুকুর মেরে গুলির ক্ষমতা দেখায়। তারপর ধানের টাহাল ও ঘরে আগুন দেয়। আগুন দেখে ভীত নরনারী বেরিয়ে এসেছিল। পুরুষদের ওরা ধরে নিয়ে যায়। ভাগলপুরে। তহসিলদার বলতে বলতে যায়, বলেছিলাম যে মামাবাড়ি দেখাব। চল্ দেখবি। এ কি মগের মুলুক রে বাবা? কোম্পানির রাজ্যে থাকব, খাজনা দেব না?

তারপর আমড়াগোড়া, তারপর বহতু। তীরের লড়াই চলতে চলতে ঘরে আগুন। ভাগলপুর কোথায়? কতদূর? পাহাড়িয়াদের চিলিমিলি সাহেব সাঁওতালদের উপর এমন বিরূপ কেন? .

ভাগলপুরে চামড়া মোড়ানো কোড়ার ঘা। ভাগলপুরে গুদাম ঘরে না-জল না-ভাত কয়েদ। ভাগলপুরে রক্তঝরা দেহে হাত-পা বাঁধা মানুষের মন্ত্রোচ্চার।

দেব না দেব না খাজনা দেব না
খাজনা দিইনি, খাজনা দেব না ॥

গুদামঘরে বন্দীদের মন্ত্রোচ্চার হঠাৎ থেমে যায় একদিন। যেদিন বন্দী হয়ে আসে তিলকার সাথী তিভুবন। তিভুবন ওদের কি বলে

আর বোঝায়। তিভুবনকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয় পাহারাদার সেপাই। বলে, ওদের বুঝাগে যা।

তিভুবন বলে, ওঃ! তোদের জন্যে মার খেলাম, কয়েদও হলাম। এখন শোন্, মনসা পাহাড়িয়া কি বুদ্ধি করেছে।

বাবা তিলকা মাঝির কথা বল্।

সে না বললে আসতে পারি?

বল্। তোর কথা শুনে ভাল লাগছে খানিক।

কাল এমন সময়ে আরো ভাল লাগবে। শোন্।

সবাই শোনে।

সকালে দরজা খোলে সেপাই। তিভুবন বলে, ডাক্ কোন মামাকে ডাকবি। কি, "মামা" বুঝিস না? তসিলদার জানে, সে মামাবাড়ি দেখাবে বলেছিল। বল্‌গা, ভাগ্নেরা ভাল হয়ে গেছে।

আবার কলেক্টরের সামনে। সবাই বলে, তারা অনুতপ্ত খুব। তিভুবন বোঝাল, তারাও বুঝেছে যে কোম্পানিকে খাজনা দিতেই হবে। তসিলদার বাবু চলুক এখন তাদের নিয়ে। হাতে হাতে খাজনা।

ক্লিভল্যাণ্ড বলে ভাল ভাল কথা। নাকে খত দিয়ে তিরিশ জন সাঁওতাল সেপাই পাহারায় ফেরে গ্রামের দিকে। গ্রামের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সাঁওতালরা নিচু হয় ও চেঁচিয়ে ওঠে একসঙ্গে। চমকে ওঠে তসিলদার, তারপর ভীষণ চেঁচিয়ে ছিটকে ওঠে।

গুলি আসছে, শব্দ নেই, ধোঁয়া নেই।

বাঁটুল মেরেছে, লোহার বাঁটুল—তসিলদার চেঁচায়। এবার আসে তীর। হাতবাঁধা অবস্থায় সাঁওতালরা গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যায় ও ছুটে পালায়। মনসা ও মহন ও কিছু সাঁওতাল বেরিয়ে আসে। চার সেপাই ও তসিলদারকে বেঁধে ফেলে তীরে। মনসা চেঁচায়, ভাগ্নেবাড়ি দেখ্, তসিলদার, মামাবাড়ি দেখালি, ভাগ্নেবাড়ি দেখবি না?

পিপল গ্রামে তিলকা। মনসা প্রায় নেচে নেচে যায়। বলে,

এরা গারদে ছিল বলে মনে তোর দুখ ছিল। নে, এনে দিলাম। নে, এখন হাস্ একটু॥

তিলকা সামান্য না হেসে করে কি।

সে হাসি দেখে মনসা যেন ভুলে গেল এ কত সংকটের সময়, পাহাড়ের চুড়ায় আগুন জ্বালার সময়, গিরা পাঠাবার সময়। ভুলেই গেল যে চার দিকে পরবপূজায় বাজনা বাজে না, চারদিকে ঘরপোড়া ছাইয়ের দিকে চেয়ে নীরব দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। যেন এ গাঁওদেওতার পূজার দিন, গোত্-মাঘ পরবের দিন, এমন আনন্দে মনসা মাথার উপর হাততালি বাজিয়ে লাফ মেরে নেচে নিল দু পাক।

তিলকা বলল, পিপল গ্রামের সকলে চল হে।

কোথা ?

প্রথম চোট পিপল গ্রামের উপর আসবে। মাঝি কোথায়, শোনো মাঝি—এখন বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে সকলকে। এখানে থাকলে সব যাবে। চলে এস।

কোথা ?

এত গ্রাম থাকতে বলো "কোথা" ? তোমার আপন জায়গা পিপল ছাড়া নাই ?

নরনারী, মোষ ছাগল, বিচিত্র সে নীরব মিছিল ক্রমে মিলিয়ে যায় বনের সবুজ, ঘন, বাতাসে পাতাঝরা উদাস ছায়ায়। তিলকা সামনে চলে। সাঁওতাল সমাজের এক অংশকে বয়ে নিয়ে চলে। স্থির লক্ষ্য। তার মাথার উপর আদিজননী আদিম রাজহংসীর ডানায় সাঁই সাঁই শব্দ। একা তিলকা শোনে, আর কেউ শোনে না।

আবার গিরা। ভাঙা মেঘে ভাঙা চাঁদের অস্বচ্ছ আলোয় পাথরের প্রান্তরে মাঝিরা, সাঁওতাল যুবকেরা। বাতাসে হিম। তিলকা পাথরের উপরে দাঁড়ায়।

মাঝি, দেশমাঝি, পরগণাইত, মেয়ে-ছেলেপিলে-বুড়োবুড়ি-চাষবাস-

গরুমোষ, সব কিছুর ব্যবস্থা দেখ। আগে সে দায় রাখো, পরে লড়াইয়ে নাম।

আমরা ঘর ধরে বসে থাকব?

ব্যবস্থা কর, তবে এস। আমিও হই মাঝি। গ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকেও। গ্রাম, গ্রামের মানুষ বাঁচাবার জন্যেই তো লড়াইটা। সে কথা ভুললে মুলে সর্বনাশ।

আর কি?

আরো কথা আছে।

আর কি?

জঙ্গল এলাকার দিকে দিকে ছড়ানোছিটানো আমাদের গ্রামগুলি। জঙ্গল আমাদের আশ্রয়। দিকে দিকে আলাদা আলাদা দল গড়তে হবে। তীর-আর বাঁটুল দূর হতে মারতে ভাল। কাছ হতে লড়াই করার মধ্যে যাব না আমরা। জঙ্গল থেকে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিয়ে লড়াই করব। হঠাৎ দেখা, হঠাৎ অদেখা। লুকাব। আজ হেথা, কাল সেথা।

বল, বল হে তুমি।

কাজ অনেক। চাষবাস চালাতে হবে, লড়াইয়ের কথা মাথায় রাখতে হবে। এই কথা।

গ্রামে গ্রামে যারা লড়বে, তাদের চিনব কেমন করে?

এটা কি কথা বললে ভাই?

সকল কাজের কাজী তুমি, চিহ্ন করে দাও।

শালগাছের ছাল নাও, যে যার হাতে বেঁধে দাও। এই চিহ্ন। চিহ্নতে কি করে? সকল জন কি চিহ্ন বেঁধে ঘুরবে?

এখানেই শেষ হয় কথা। আর লড়াইটা কেমন হবে তা তিলকাকেই দেখাতে হয়। যেদিন তিতাপানি নালা পেরিয়ে সুঁড়ি-পথে জঙ্গল-এলাকায় ঢোকে ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর একশো সেপাই। প্রত্যেকের থাকে বন্দুক। ঢোকার সময়ে ওরা হিংস্র চোখে খোঁজে

সাঁওতাল গ্রাম তিতাপানি। গ্রামটি যে নালা থেকে অনেক ভিতরে তা তারা সঠিক জানে না।

ক্লিভল্যাণ্ডের নির্দেশ—জঙ্গল-এলাকার ভিতরে কতগুলি গ্রাম আছে সঠিক জানি না। কেউ কোনোদিন ঢোকেনি। খানিক পাহাড়, বেশিটা জঙ্গল। যেন প্রকৃতি রচিত এক সুবিশাল দুর্গ। তাই সাহস করে ঢুকবে। গ্রাম-কে-গ্রাম পিপল করে ছাড়বে। গ্রাম জ্বালাও, গুলি চালাও। বুনো বর্বর মানুষগুলি বুঝবে আমরা বেশি শক্তিশালী। ভয়ের চোটে বশ মানবে। আর পুলিসবাহিনী যাক পিপলের দিকে। সেদিকটা অরক্ষিত। সরকারের লোক মেরেছে যারা, তাদের বশ মানাতে হবে।

ফিলিপের প্রশ্ন—তাঁবু ফেলব ?

দরকার হলে ফেলবে।

জঙ্গল এলাকায় ঢুকে ফিলিপ দেখেছিল, জঙ্গল আর উঁচুনিচু জমি আর ঝরাপাতা বুকে নিয়ে তিতাপানি নালার বহে চলা পাথরের ফাঁকে আর পাহাড়। গ্রামের দেখা নেই, মানুষের কথা বা মোষের গলার থরকির আওয়াজ শোনা যায় না। দেখা যায় না আগুনের আভা বা খেত।

তাঁবু ফেলেছিল ফিলিপ। পাথরের উনোনে আগুন জ্বেলে রান্নার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কোম্পানির কাজ কেতামাফিক। এত ছোট ফৌজের সঙ্গেও বাজনদার, মশালচি, বাবুর্চি থাকে।

শান্ত, শান্ত ছবি। আঁধার না নামতে আকাশে তারা। তারই মধ্যে হঠাৎ মনে হয়েছিল ফিলিপের, গাছের বেষ্টনি যেন কাছে এগিয়ে এসেছে। কালো কালো নিশ্চুপ। এ কি ব্যাপার? জঙ্গল এলাকাটা প্রেতউপত্যকা নাকি ?

কালো কালো স্তব্ধতাগুলি হঠাৎ ছিটকে উঠেছিল। তীর, তীরের পর তীর। তীরের ফলায় ন্যাকড়া জড়ানো আগুন। তাঁবু জ্বলেছিল।

এদের বন্দুক না গর্জাতে ওরা হাওয়া। অন্য দিক থেকে তীর। আর সদম্ভ ঘোষণা।

পিপল গ্রাম শ্মশান এখন। এরা করেছে। পিপলের নাম নিয়ে আগাও হে হাজার জন।

ওরা হাজার সাঁওতাল সাহেব, আমরা এ কারবারে নেই—সেপাইদের পালাবার চেষ্টা। ফিলিপ ছোঁড়ে বন্দুক আর কাঁধে খায় তীর। তীর তুলতে ফিনকি দিয়ে রক্ত। হতাহতদের ফেলে রেখে ফিলিপও দোড়য় সেপাইদের সাথে। তীর। মশাল জ্বেলে ছুটে আসে সাঁওতালরা। পাথরের ফাঁকে মশাল গুঁজে টাঙির কোপে নীরব করে দিতে থাকে আহত সেপাইদের গলা।

সব শেষ হয়ে গেলে কপালের ঘাম মুছে মনসা থুথু ফেলে। বলে, তিলকা।

কি?

এলাম পঞ্চাশ জনা, তা হাজার সাঁওতালকে ডাক দিলি যে, হাজার জন পেলি কোথা?

তিভুবন বলে, ওই পঞ্চাশজনই হাজার হয়েছিলাম।

পিপলের পুলিসবাহিনী মার খায় পিপলে ঢোকার পর। যাদু পরগণাইত ও তার সাঁওতালদের হাতে।

এখন গ্রামে গ্রামে এ-ওর হাতে শালগাছের ছালের টুকরো বাঁধে। তিলকা মাঝির নাম নিমেষে ছড়ায়। সংঘর্ষ চলে, একের পর এক। ছয় মাস বাদে বর্ষা নামলে জঙ্গলএলাকা হয় দুরধিগম্য। তিতাপানি ও ধারা ফুলে ফেঁপে ওঠে। পাহাড়ী ঝর্ণা নামে ও ধেয়ে বহে চলে। নালা-নদী ও ঝর্ণা জঙ্গল এলাকার পরিখা এখন। ক্লিভল্যাণ্ড মুলতুবি রাখে জঙ্গল একাকার বিরুদ্ধে অভিযান। কোম্পানির সব কাজই কায়দা-কেতামাফিক। বাজনা বাজিয়েই তারা পশ্চাদপসরণ করে।

মরেছে এ পক্ষে যত, ওপক্ষে তত যুদ্ধের এ প্রথম পর্যায়ে। বর্ষার সমাগমে তিলকারা চলে আসে ধান রোপাইয়ে আর সোমী, তার

মা—রূপা, তার বউ—তারা বলে, তোমাকে, তোমাদের মত লড়াকু লড়হাইয়াদের করতে হবে না কিছু। তোমরা ভাবো লড়াইয়ের কথা। ধানের বীজ ফেলে চারা আজানো কাজ? সে আমরা করে নিয়েছি।

পুরুষদের যে কাজ, লাঙল চালানো, তা কে করল?

সোমী, তিলকার মা, বিস্মিত চোখ তুলে বলে, কেন? পাহাড়িয়ারা? মনসা বলে দিয়েছিল। আমরা ওদের ধান কেটে দেব।

পরবপূজা?

খানিক হয়, খানিক তোলা আছে। মড়ে়ংকোকে মানত জানিয়ে রেখেছি, দোষ নিও না দেবতা। আমার তিলকা সুদিন নিয়ে আসুক সাঁওতালদের, ধুমধামে পূজা দিব।

বর্ষা চলে। মনসা, মধু ও মহন ঘুরে ঘুরে কামারদের দিয়ে লোহার বাঁটুল তৈরি করায়। আন্দোলিত প্রান্তর, মাঝে মাঝে গ্রাম ও খেত, আর জঙ্গল। বর্ষায় সর্বত্র বহে রাঙা জল। তারই মধ্যে টোকা মাথায় ওরা চলে আর চলে। পাহাড়িয়া যুবকরা আরো কিছু আসতে পারে মনে হয়। তিলকা, তিভুবন—সনা ও হারাকে নিয়ে ঘোরে। হ্যাঁ, মনের জোর ঠিক রাখ তোরা। তীরের ফলায় শান দে। বাঁটুল ছোঁড়ার হাত ঠিক কর।

বর্ষা শেষ হয়ে আসে আসে। এখন চলে আসে চাঞ্চিধানুকরা। আমরা কি শতখানেক নেই? আমরাও ব্যাধ। কাঁড় ও ধনুক আমাদেরও বশ। ফৌজ আর পুলিস আসবে যখন, আমাদের ছেড়ে দেবে? আমরাও লড়ব।

তিলকা সেবার ঘুরে এসে রূপাকে বলে, পাহাড়িয়ারা কোম্পানির সঙ্গে মিতালি করে যে দোষ করেছে, সে দোষ কাটাতে মনসারা তিন জন প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে। চাঞ্চিধানুকরাও এল দেখছি।

কামারদের কথা ভুলে গেলি? রতনমণি হেঁকে বলে

ভুলিনি কামার কাকা।

এই নে। খুব সর্দার হয়েছিস এখন। লড়াই তোর কাজ। তো নে, আমার এই ছিল।

তীরের ফলা। ছোট সড়কি।

সড়কি, ছোট সড়কি

তোমাদের জন্যে বানাই, দিয়ে গেলাম কিছু।

তোমরাও লড়বে ?

তা বাপু, কোম্পানী কোনো কথা না বলে যদি খাজনা নেবার জন্যে ফৌজ পাঠাতে পারে—আমরা যে যার মত একটু লড়ব না—তোরা তো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

বর্ষায় প্রান্তরে ছিল কেয়াফুলের গন্ধ। বর্ষা কাটতে পরব আসে। দিগ্‌বিজয়ের ঋতু। বার বার মার খেয়ে ক্লিভল্যাণ্ড পালটায় রণনীতি। একই সঙ্গে ছয়টি ফৌজ আক্রমণ করে অঞ্চল প্রান্তের সাঁওতালবসতি-গুলি। মোরেল, হেবার, গেব্রিয়েল, অ্যাসকট, মিটফোর্ড ও হুইলার থাকে পুরোভাগে। মিটফোর্ড আনে পঞ্চাশজন পাহাড়িয়া সেপাই। যদি কেউ পথ দেখাতে পারে এ জঙ্গলে তো ওরা পারবে। সব চেনে ওরা, তিলকাকেও চেনে। মিটফোর্ড ও তার সেপাইরা ঢুকে পড়ে, ঢুকে যায়। ধারা নালার গতিপথে উজানে এসে ওরা নালা পেরোতে যায় ও উঁচু পাড়ের উপরের কেয়াঝোপের পিছন থেকে সহসা আসতে থাকে তীর ও বাঁটুল। সেপাইদের হাতে তরোয়াল। নতুন হাতিয়ার এগুলি। মিটফোর্ডের আছে ঘোড়া ও বন্দুক। আজকে লড়ো সেপাই, কাল পাবে ঘোড়া, টাকার তোড়া বন্দুক। মিটফোর্ড বন্দুক ছোড়ে। আর্তনাদ। কেউ পড়েছে। আবার তোলে বন্দুক। তীর বেঁধে হাত ফুটো করে ও বন্দুক পড়ে যায় জলে। মিটফোড ছিনিয়ে নেয় একজনের তরোয়াল।

আরে, কোম্পানি বাঁ হাতে তরোয়াল ঘুরায় যে!—হাসে তিলকা ও বাঁটুল ছোঁড়ে। দু হাত বিকল মিটফোর্ডের। টাঙি ও তীর ধনুক হাতে তিলকার ফৌজ দাঁড়িয়ে পড়ে ঝোপের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে।

মনসা চেঁচায়, আরে পাহাড়িয়া ধান্নু, জগলাল, সদান্! সুন্দ্রা মাঝির চাল খেয়ে আকালে বাঁচলি, আজ তার বেটার উপর হাতিয়ার উঠাস ?

কোম্পানির নিমক খেয়েছি মনসা—

তো সে চালের ভাত আজ বমি করাব। আরে আরে, জাতধর্ম ছেড়ে তোরা কোম্পানির কুত্তা হয়ে গেছিস মনে বুঝি। তাতে কাঁড় ধনুক হাতে নাই। তরোয়াল এনেছিস। নিচে তোরা হাতে তরোয়াল উপরে আমরা হাতে কাঁড় ধনুক। কোম্পানি বাপ বাঁচাক তোদের।

হা মনসা তুই পাহাড়িয়া মারবি ?

পাহাড়িয়া ? তোরা পাহাড়িয়া নাই আর।

কেন

গ্রামে আসতে চা, বুঝবি। এখন পাহাড়িয়া সাঁওতাল আবার এক। যেমন ছিল।

সে কি কথা ? তা ত জানি নাই।

মনসার তীরে ঘুরে পড়ে ধান্নু। মনসা চেঁচায়, সর্দারের বেটা হই আমি, বেইমানরে শাস্তি দিলাম। তোদের রক্তে ধারা নালা লালে লাল করে দেব। সাঁওতাল গ্রাম জ্বালাবি, মেয়ে-বাচ্চা কাটবি, বাপ হুকুম দিয়েছে !

পাহাড়িয়ারা চেঁচিয়ে ওঠে, মারিস না আমরা তরোয়াল ফেলে দিব।

'দিব," দিস নাই এখনো।

সদান ও ধান্নু চেঁচায়, ও মিছা বলে। ফেলিস না তরোয়াল কোম্পানি মেরে দিবে।

সদান, ধান্নু ও আর ক'জন পড়ে মাটিতে। অন্যরা ছুটতে থাকে তীর খায়, পড়ে। মিটফোর্ডও ছোটে। পূর্বদিকে তখন আর্ত চীৎকার ও কলরোল। তিলকারা সেদিকপানে ছোটে। জাঠা গ্রামে ঘর দোরের মাঝ দিয়ে চলেছে হুইলার ও তার ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ পবন কিসকু ও তার লোকদের। যথারীতি হুইলার একা

নিয়েছে বন্দুক ফৌজের হাতে তরোয়াল। দু পক্ষেই লাশ ও জখম পড়ছে। তিলকা ও মনসা এসে পড়াতে সাঁওতালরা আবার নতুন প্রাণ পায়।

তিলকা বলে, আড়াল হ, আড়াল হতে মার।

আজকের ছয়মুখী যুদ্ধে কোম্পানির তরফে ক্ষতি অনেক বেশি হয়। তিলকা বলে, কিসারার গ্রাম ছাড় সবাই। চলে যা ভিতরে।

ঠিক নয় দিনের মাথায় আবার আসে কোম্পানির ফৌজ। এবার প্রত্যেকে বন্দুকধারী। জাঠা ও কোটরা গ্রাম সেদিনের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, জনশূন্য। গ্রাম জ্বালিয়ে তারা সদম্ভে এগোয়। কিন্তু খুবই অলৌকিক ঘটনা ঘটে। মাটি থেকে ছুটে আসে তীর, দু পাশের বনাঞ্চল থেকে। তীরের উৎসে গুলি ছুঁড়ে দেখা যায় মাটিতে কাঠের খোঁটা পুঁতে পাতা আছে ধনুক। ছিলার সঙ্গে দড়ি বাঁধা। চাঞ্চ ধানুকদের পাতনকাঁড় বা এ পদ্ধতিতে তীর ছোঁড়া জানে না কোম্পানির ফৌজ। বদমাশ লোক কাছেই হবে জানে তারা। দুমদাম বন্দুক ছোড়ে। তারপর বন্দুক বাগিয়ে এগোতে থাকে। এগোয়, তারা এগোয়। সহসা সামনে পড়ে হুড়মুড় করে এক গাছ। রাস্তা আটকে যায়। পিছনে পড়ে গাছ। ভীষণ বিভ্রান্তি। এখন আসে তীর। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। গুলি বনাম তীর। আবার গুলি আবার তীর। দৌড়ে চলে যাবার খচমচ শব্দ হঠাৎ। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। আবার গুলি, আবার তীর। আর গুলি নেই, পিছু ফেরো। পিছন থেকে আসে সমবেত ধিক্কার ও চীৎকার। ফৌজ ঘোড়া ছুটিয়ে পালায়। আহত ও নিহতদের তোলে না।

আর তিলকা মনসাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে দৌড়তে থাকে। পাঁজরা থেকে উছলে বেরোয় রক্ত। মনসার শরীর আরও শিথিল, আরো ভার হয়। এখানে ঘাস আছে, এখানে সব শান্ত। মনসাকে শোয়ায় তিলকা।

মনসা! মনসা! মনসা!

মনসা আস্তে, অনেক চেষ্টায় তাকায়

তিলকা !

বল্ ।

আমাকে গ্রামে নিস না ।

তুই ভাল হবি ।

যেখানে সকলকে গোর দিয়েছিস, সেখানেই দিবি বল ?

হ্যাঁ মনসা । সেখানেই মাটি দিব ।—যে কোন জায়গায় ।

যে কোন ভাবে, যেখানে মৃত্যু সেখানেই ।

পাহাড়িয়া বেইমানিটা নয় ।

না মনসা, জানি ।

ধান না পাকতে ।

কি ?

ওরা আসবে ।

জানি । আবার লড়ব ।

মাথা হেলায় মনসা । ধান না পাকতে কোম্পানি ফৌজ আবার আসবে এই ভীষণ জরুরী খবরটা জানানো হয়ে গেছে । তিলকা বলেছে আবার লড়বে—সে জরুরী খবরটা জানা হয়ে গেছে । অন্য নিহতদের মত তারও হবে অচিহ্নিত সমাধি, তাও ভরসা পেয়ে গেছে । মনসা পাহাড়িয়া যে পাহাড়িয়াদের হয়ে সব বিশ্বাসহীনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল তাও জেনেছে তিলকা । আর কি ? মনসার মাথা এবার আত্মসমর্পণে হেলে পড়ে, পাশে বেঁকে যায় ।

মশাল জ্বেলে তিলকা, মধু, মহন, তিভুবন, হারা মাইলের পর মাইল হেঁটে যায় মনসাদের গ্রামে । মনসার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা । মনসার বাবা মনসার ধনুকটি কোলে নিয়ে বসে থাকে । ওরা চলে আসে ।

পরদিন নেমে আসে এক আশ্চর্য মিছিল । নীরব ও পাথর-পাথর মুখ পাহাড়িয়া যুবকদের এক মিছিল । তিলকার সামনে এসে দাঁড়ায় ।

হাতে শাল ছাল বেঁধে দাও। মনসা পাহাড়িয়া নাই, আমরা আছি।

তিলকা রাতজাগা লাল চোখে তাকায়।

আমরা যাই না ফৌজে, আমরা বহুতদিন তোমাদের গ্রাম আগলাই তোমরা ঘরে থাক না। এখন আমরা তোমার কথা মানব। নাও ধরো।

তিলকা বোঝে, মনসা তার কাছে এমনি করে পাহাড়িয়াদের এনে দিয়ে গেল। ও বাঁধে রাখী।

পাহাড়িয়ারা সাঁওতালদের চেয়ে বেশি সংস্পর্শে এসেছে বাইরের জগতের। কোম্পানির। টহল পাহাড়িয়া বলল, বলো যদি তো কিনারার বিশ পঁচিশটা গ্রামবসত ভিতরে উঠিয়ে আনি। চোট আসবে ওদের উপর আগে। চিলিমিলি সাহেব ভুলে না কিছু।

ভোলেনি ক্লিভল্যাণ্ড, ভোলেনি কিছু। ভুললে তার চলে না। ভারতে ইংরেজ শোষণের এক নগণ্য এজেন্ট মাত্র ক্লিভল্যাণ্ড। খুব তাড়াতাড়ি বিলেতে পাস হবে পিট্-এর ১৭৮৪ সালের ভারত আইন। তার গোড়াতেই ঘোষণা করা হবে, ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য নয়। ব্যবসাবাণিজ্য করতে গিয়ে সাম্রাজ্য ফেঁদে বসলে ইংরেজ জাতির নীতির বড়াই করা সাজবে না। জাতির মর্যাদা নষ্ট হবে। আর এদিকে চলবে সাম্রাজ্য বিস্তার। নবাবের প্রাসাদ থেকে সাঁওতালের জঙ্গল-আবাদী গ্রাম সব নিতে থাকবে ইংরেজ। চলবে বিদ্রোহ।

ক্লিভল্যাণ্ড খবর পেয়েছিল, পাহাড়িয়ারা সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তাই ক্ষেপে গিয়ে তার সহকারী রবার্টস আর পুলিস কমিশনার গুডউইলকে বলেছিল, পাহাড়িয়া সেপাইদের ডাকো। ওদের দিয়ে গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালাও। জঙ্গলের লোক দিয়ে জঙ্গলের লোকদের মারতে হবে। ওদের একতা ভাঙা দরকার।

একতা কোথায় দেখলে ?

এখানে নয়, পাহাড়ে, নিজের জায়গায়।

গ্রাম সর্দারদের সঙ্গে কথা বলো। ওরা বুঝলে অন্যদের বোঝাবে। এখন তো আর যাও না।

অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে পাহাড়িয়া ফৌজের তিরিশজনকে দিয়ে ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়িয়া গ্রামসর্দারদের কাছে পাঠায় খাসি, চাল, নতুন কাপড়। বলে, বলবে তাদের—চিলিমিলি সাহেব বলেছে সাঁওতালরা বদমাশ আর জংলী। ওদের সঙ্গে তোমরা মিলতে গেলে ভুল করবে। তিলকা মাঝিকে আমি ধরব, শাস্তি দেব। বলবে, কোম্পানি সরকার এখন দেশের কোতকছলের কর্তা। কোম্পানির সঙ্গে লড়তে গেলে ফল খুব মন্দ হবে।

বলব, নিশ্চয় বলব।

সেই যে যায় তিরিশ জন, আর ফেরে না। গাছের ডালে জামা, কোমরবন্ধ আর পাগড়ি ঝুলিয়ে রেখে সিধা চলে যায় তিলকার কাছে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্যে যখন ফৌজ চলে আসে, তখন এরাই তাদের তীর ছুঁড়ে ঘায়েল করে। হেঁকে বলে, কোম্পানি ফৌজ। বাবা তিলকা মাঝির আদেশ শুন। জঙ্গল এলাকার মানুষ খাজনা দেবে না, জমির দখল ছাড়বে না, বিবাদ করবে না। কিন্তু পায়ে পা বাঁধিয়ে বিবাদ করলে এই এমনি করে তীর মারবে। এমনি করে মারবে বাঁটুল। নিশানা ভুল হবে না হে, এই দেখ।

পরাজয়, পরাজয়। ক্ষিপ্ত ক্লিভল্যাণ্ড বলল, আমি নিজে যাব। আমার সঙ্গে থাকবে কামান, থাকবে বন্দুক।

বাঁকা কিসকু বাতাসের আগে ছুটে এল। জবর খবর এনেছে সে। মতি লোহার চিলিমিলি সাহেবের চাপরাশি। সে ভাগলপুরে ফৌজী বাজারে বলেছে, সায়েব তো নিজে চলল তিলকা মাঝিকে মারতে এখন কি হবে ?

সর্জন সিং ঘাটোয়াল নিজের কানে শুনেছে।

তিলকা বলল, তবে তো দেখা করতে হয়। মানী লোকটা আমার মত বুনো সাঁওতালের জন্যে ভাগলপুরের কুঠি ছেড়ে চলে আসছে যখন।

হারা বলল, ওঃ, সেথা মাথার উপর টানাপাখা চলে গরমে আর এমন শীতে জ্বলে আগুন।

টহল পাহাড়িয়া তুষের আগুনের কাছে এসে বসল। বলল, সাহেব কত পদে খায় গো, দশ পদে।

মধু পাহাড়িয়া বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাদের যীশুর পরবপূজায় টেবিলে আনে এই এত বড় ময়ুর।

ময়ুর আনে?

অত বড় পাখিটা, মনে ভাব্‌ তোরা দেখি? চোখ বুজে ভেবে নে। ময়ূরের গোটা দেহ বড় বড় খণ্ডে কেটে ঘিয়ে ভাজে, মশলায় ভাজে, টেবিলে আনে। সাহেব বাঘের গরাসে খায়, তার বন্ধুরা খায়।

তিলকারা কথাগুলি বলছিল আরিয়া গ্রামের দেশমাঝির উঠোনে বসে।

তিলকা বলল, কি বুঝ হে সজো হাঁসদা? শুনলে তো এদের কথা?

কি বুঝব?

দেশমাঝি তুমি, বুঝ না কিছু?

"তুমি" বলছিস, এই বুঝলাম।

দূর বেটা, তাই বুঝলি?

আরো বুঝলাম।

কি বুঝলি?

না, যে সাহেব এমন খায়দায়, এমন ঠাটঠমকে থাকে, মান আছে তার একটা। আমারে যদি বলিস, তো সাহেবটা সাদা, তারে এনে মারাংবুরুর কাছে জাহেরথানে মাথাটা চোপায়ে নামায়ে দেই। পূজাটা ভাল হবে।

দেওতা নিবে না।

তবে তো তারে আগায়ে যেয়ে দেখতে হয়। আরো মনে ভাবি, মানী গুণী মানুষটা, তোরে তো কত গুলি কত গোলা ভেজতে বাতাস ভরে। তু কি ভেজবি ?

হ্যাঁ, এ এক কথা বটে। তা তোর কি শুধু কথা, না কোনো ব্যবস্থা করছিস্ ?

ভেট আসতেছে, তোর সর্জন সিং ঘাটোয়াল। সে মানুষ আমাদের হাতের মানুষ, ভয়ও খায় খুব। ভালবাসে আমাদের। এতবড় মন্বন্তরে তারে, তার পরিবারকে আমি বাঁচাই। মানুষ মরল শুকায়ে। সর্জন সিং বনের মূল কান্দা, শিকারের মাংস, কলাই সিদ্ধ, চীনা ধানের চাল খেয়ে ভাকুমকুমা মোটা হয়ে বেরোল। সে তোর ভেট আনতে দূরে দূরে কামারবাড়ি গেছে।

ও কে। সজো ?

ও ? পলান্ রবিদাস। আমাদের তালাসে কোম্পানি ফৌজ ওদের গ্রামে ঢোকে সে বছর। গ্রাম জ্বলল, বহোত্ মানুষ মরল, ধান-চাল উধাও। পলান্ আগুন তাপে দু চোখ দিল। এখন এখানে।

কাঁদে ?

না, গান করে।

সর্জন তো আসে নি। পলান্ হে, আগুনের কাছে এস, কাছে এসে গান গাও।

পলান্ অমানুষী দক্ষতায় তিলকার কাছে চলে এল। বলল, তিলকা মাঝি ! বাবা তিলকা মাঝি ! চোখ থাকতে দেখি একবার, হাটে। চক্ষু যেতে শতবার দেখি। তিলকা মাঝি, বাবা তিলকা মাঝি !

দেওদেওতা হয়ে ভক্তি পেতে তিলকার বড়ই বিরক্তি। সে বলল, গান গাও ভাই।

পলান্ রবিদাস বেশ মতামতের মানুষ। সে বলল, দুটো গান গাইব।

তাই গাও। কাঠের ঠকঠকি বাজিয়ে পলান্ গান ধরল।

ঘর পুড়েছে ছাই উড়ছে

ভিটায় গজায় বন

গোহাল ঘরে বনটিয়া

রুক্কন কোথা, ঝুক্কন কোথা

সুখন লছমন শাবন কোথা

আমি রুক্কন, আমি গোহালে

আমি ঝুক্কন, আমি ঘরে।

সুখন লছমন শাবন ঘুমায়

বাজরা ক্ষেতে নদীর চরে॥

পলান্ থামল, মুখ মুছল। তারপর সকলকে চমকিত করে দুঃখ বিষাদের ভার ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠল,

মুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো তেঙ্গোন,

খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,

খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,

দিশম দিশন দেশমাঞ্জহি পারগানা

নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো

দঃ বোন দানাং বোন বাং গোকো তেঙ্গোন

তবে গেবোন হুলগেয়া হো।

তিলকা বলল, নিচু গলায় তীব্র আবেগে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই আমাদের কথা। আমরা যারা যুদ্ধ করি সকলের কথা।

আমরা বাঁচব, আমরা উঠব,

কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব, আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব দেশের মাঝি ও পারগানারা, গ্রামের মোড়লরা,

আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে, কেউ পাশে দাঁড়াবে না তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব।

পলান্, পলান্, এ গান তুমি কোথায় শিখলে? তুমি এ গান শুনলে কোথায়?

তিলকার ভাবাবেগে জল ঢেলে দিল সজো। বলল, দেখ্ দেখ্ তোরা। এতবড় মানুষটা হয় তিলকা। আমাদের বাবা তিলকা মাঝি এমন করে সবারে নিয়ে শাল গিরার ডাক পাঠায়ে লড়াইয়ে নামে। এমন করে হুল্ তুলে দেয়। সে কেমন ছেলেপিলা, গিদরা-পিদরার শামিল কথা বলে। তিলকা! হুল্ উঠাছিস্, বহোত লাশ ফেলছিস কোম্পানির—বহোত লাশ পড়েছে আমাদের—সব পারিস আর গানের কথায় এ কি বললি? এ গান ফিরে সবার মুখে। আরো কত গান ফিরে। হুল্ চলবে তো হুলের গান হবে না? এটা কি বললি তুই?

ঠিক বলেছিস, ঠিক। হুল্! আঃ, হুল্! নাচতে ইচ্ছা করে আমার রে সজো।

কেন? কি হল?

কি? সবাই তাকাস কেন? না না, পাগল হই নাই আমি। করি হুল্, বলি লড়াই, সবাই মিলে যেমন কুলকুলি দিয়ে হাড় কাঁপাই তেমন করে "হুল্"! বলে চেঁচিয়ে এগোতে হবে। আয়, চেঁচা।

সজো হেঁকে বলল, বিটিরা ঘরে যা। গোহালে গাইগরু যেমন বাঁধা থাকে। এ বাবা তিলকা মাঝি। আমাদের দেবদেওতা এখন।

হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে তিলকা ও অন্যরা টেনে দম নিয়ে দু হাত জড়ো করে মুখের কাছে নিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "হু——ল্! হুল্! হুল্!"

সে চীৎকার গ্রাম ছাড়িয়ে বনে, বন ছাড়িয়ে দূরে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে এসে আছড়ে পড়ল সর্জন সিং। বলল, জল দে দেশমাঝি! বেশ আসছি, কি একটা চীৎকার শুনলাম।

ও বাবা রে, যেন পাহাড় বন শতমুখে চিল্লায়। হাসিস কেন? তোরা চেঁচালি?

ওর ঝোলাটি দেখে সবাই আবার চেঁচিয়ে উঠল "হুল্!"

সর্জন কামারবাড়ি থেকে তীরের ফলা, লোহার বাঁটুল এনেছে। তিলকা মাঝি চিলিমিলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। মানী লোকের ভেট হয় এগুলি।

সর্জন সিং বলল, তিলকা! তুই একটা কথা মনে রাখবি। তোরা বুঝিস সিধাসাফা লড়াই। সাহেবরা মুখে কথা বলতে বলতে চোরা গোপ্তা গুলি চালায়। আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে আর ধপাধপ পাছাড় মারে। মুখের হাসি মিলায় না কোড়া মেরে রক্ত ছুটায় কয়েদীর।

মানী লোক হয় সে। কামারশালে আরো বরাত দিয়ে এসেছিল তো?

সে আর বলতে?

এখন আমরা ব্যস্ত। যখন সব শান্ত হবে, ধান কলাই সরিষা দিয়ে মজুরি আর লোহার দাম দেব তা বলেছিস তো?

বলেছি, বলেছি।

তুই হিসাবটা রাখিস।

রাখব। কিন্তু এত দিবি বা কেন? আকালে সবাই তোদের দয়ায় বাঁচে নাই কত জন?

ঘাটোয়াল হয়েছিস, মানুষটা তুই ভাল। কিন্তু তোদের সমাজের হিসাব আমরা মানি না। আকালে বনের মূলকান্দা, শিকার, ঘরের কলাই দিয়ে সাঁওতালসমাজ যদি কারো জান বাঁচিয়ে থাকে, সে কি একটা বড় কাজ? এ কাজ তো করতেই হয়। সে জন্যে এখন দাম দিব না, জিনিস নিব?

সর্জন সিং ঘাড় ঝেঁকে বলল, সে তোরা যা বলিস। তবে আমিও কম যাই না। গ্রামে গ্রামে ঘুরি যখন, তখন সকলকে যমের ডর

দেখাই। বলি, সাঁওতালসমাজ তখন কি করেছে তোমাদের জন্যে তা মনে রেখো। এখন লড়াই চলে কোম্পানিতে সাঁওতালে। কোম্পানিকে ডর খেয়ে সাঁওতালের উপর দুশমনি কোর না হে কেউ।

বললি এ কথা?

বললাম।

কোম্পানির চাকর না তুই?

হাঁ হাঁ।

কোম্পানির ইমান দেখবি না?

একশো বার দেখব, আর দেখছিও।

তাও দেখছিস, তিলকাকেও দেখছিস?

কেন দেখব না? তিলকা হল রামজীর অওতার। চিলিমিলি সাহেব বনেছে রাবণ, সে জন্যে তিলকা হাতিয়ার ধরেছে। ভালো কথা তিলকা, আমরা, রাজপুতরা তোর লড়াইয়ের নামে পূজা দিলাম। অনেক খেয়েছি রে হরিণ। চলি এখন। সাহেব ভাগলপুর ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে—তা ধর্ একদিনের পথ চলে এল।

আসুক, এগোক।

সর্জন চলে গেল। বনতিতিরের মাংস, কলাইয়ের ডাল আর চীনা ধানের চালের জাউভাত খুব খেল তিলকারা।

মধু পাহাড়িয়া ও হারা সাঁওতালের তীব্র তীক্ষ্ণ বনচেরা কুলকুলি ভেসে এল এক সময়ে। তিলকা উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ রুক্ষ কোঁকড়া চুলগুলি জালি সুতোয় বোনা লাল জালের ফেটিতে কপাল ঘিরে জড়ানো। কোমরে খাটো ধুতি, কাঁধে জালের গেঁজিয়াতে গুলতি বাঁটুল, পিঠে ঝুলানো তীরপোষ। হাতে ধনুক ও তীর। উচ্চতা সাধারণ, বৈশিষ্ট্য কাঁধ, ঘাড় ও হাতের কবজির বলিষ্ঠ গড়ন। যুদ্ধের পর যুদ্ধের চিহ্ন কপালে, বাহুতে, পিঠে। সব চিহ্ন মিলাবে না। বাকি জীবন বইতে হবে।

আধা দৌড়ে চলে ওরা। রক্তজাত শৃঙ্খলায়। যেতে যেতে সজো বলে, কি হবে এ লড়াইয়ে আজ ?

আজকের জিত আমাদের।

কেমন করে জানিস ?

কাল হতে ধারা নালার চরে সাদা হাঁস উড়াল দিয়ে আসে আর বসে। সপনটা মনে পড়ে গেল। শীতে ওরা উড়ে আসে, জানি। কিন্তু তখনি মনে হয় প্রথম আয়ু ডানা ঝাপটে আমার বুকে বসেছিল সপনে। মনে বল পাই। লড়াইয়ে জোশ বেড়ে যায়। তাতে জানি।

তুই দেওদেওতার মানুষ।

আজকের জিত আমাদের। নয়তো হেরে পালাব যেমন, পিছন পিছন ধাওয়া করে আসবে চিলিমিলি সাহেব।

হ্যাঁ, জঙ্গলে ঢুকে যাবে।

জঙ্গলে ? জীবনে ঢুকে যাবে। পাকা ভিতে অশ্বত্থের বীজ যেমন ঢোকে। আর বেরোবে না। সব খেয়ে নেবে। চল্, কদম বাড়া। হোই, হোই ওরা ! ওঃ, হাজার ধনুক এনে ফেলেছে যে।

দে, আওয়াজ দে।

হুল্—হুল্—হুল্।

ওরা সবাই চলতে থাকে। খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো। তিলকা বুঝতে পারে ওর রক্তের কণাগুলি আনন্দে ছুটাছুটি করছে। বন-পেরিয়ে তিতাপানির চরের ওপারে সমতলে নাহার সিংয়ের শস্যক্ষেত্রে দেখতে পায় ওরা সাহেবকে। ফৌজে অনেক সাহেব, অন্যরাও আছে।

তিলকা বলে, পাথরের আড়ালে বসে যা তীর মেরে। ওরা ছুঁড়বে গুলি। গুড়ি মেরে নদীর উজানে যা। হারা। তোরা থাক জঙ্গলের ধারে। বন্দুক কত রে। মারবে অনেক। মারুক। জিত আমাদের। নয়তো ইলাকা গেল, আবাদ গেল, সমাজ গেল। লে, চেঁচা সবাই একসঙ্গে।

হুল্—হু—ল্।

পাথরে বেজে বনে ধাক্কা খেয়ে সে চীৎকার আকাশপানে উঠে যায়। এখনো বেশ আঁধার। বন্দুকের গর্জন।

আঁধার আড়াল দিবে, নির্ভয়ে লড়্। আলোতে সর্বনাশ। হারা, মধু, তিভুবন, কেশর ধানুকী, যে-যার লোক নিয়ে ভাগ-ভাগ হয়ে ছড়িয়ে যা।

চারিদিক থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তীর চলে, লড়াই চলে। যতক্ষণ আঁধার হে, ততক্ষণ আমরা ভালো আছি। তিলকার পাশে পাথরে কি ছিটকে ওঠে। গুলি।

তিলকা, মাথা নামা। নিচু হয়ে চল্।

তুই মাথা নামা সজো।

দেখ্, তীর বিঁধা ঘোড়া ওটা।

দেখছি।

আর দেখ্, পুব আকাশে বুঝি—তিলকাকে বিস্মিত করে ছিটকে ওঠে সজো. আছড়ে পড়ে। হারার চিৎকার, তিলকা। সেপাইয়া পাথর বেয়ে ওঠে—সজোকে ফেলল। তিলকার খুব কাছে একটা মুখ। আকাশ ফিকে হয়েছে। ওদের হাতে সঙিন। কয়েকটা মুখ। সজোর টাঙি তুলে নেয় তিলকা। সজোকে মেরেছিস, সজো দেশমাঝিকে। কানা করে দিলি আরুয়া গ্রাম, চালা টাঙি। হারা ও ত্রিভুবনও এসে পড়েছে।

তিলকা চেঁচায়, আর আড়ালে রব না হে, তিস্তাপানির জলে আষাঢ়িয়া ঢলের মত নামব।

আষাঢ়িয়া ঢলের মত নামে ওরা। ক্লিভল্যাণ্ড কোথায়, চিলিমিলি সাহেব? চালা, বন্দুক চালা। চিলিমিলি সাহেব শিঙা তুলে কি বলছে?

তিলকা মুর্মু, তিলকা মুর্মু। তিলকা মুর্মু।

তিলকা নিরুত্তর।

তোমার লোকদের ফিরাও, লোকদের ফিরাও।

তোমার ফৌজ ফিরাও আগে।

চিলিমিলি যেন বোঝে না, ধরতে পারে না কোন দিক থেকে শব্দটা এল।

তোমরা কোম্পানি ইলাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করছ। কাল রাত থেকে বহুত ফৌজের প্রাণ নিয়েছ, কোম্পানি আরো ফৌজ এনে ইলাকা হতে তোমাদের বের করে দেবে।

জঙ্গল ইলাকায় তোমরা বে-হক ঢুকেছ, নিরীহ মানুষ মেরেছ, ঘর জ্বালিয়েছ, আমরা তোমাদের বের করে দেব। শিঙা ফেলে বিদ্যুদ্বেগে তিলকার দিকে বন্দুক তোলে ক্লিভল্যাণ্ড। তিলকার গুলতি থেকে বাঁটুল ছুটে যায় পর পর। তিলকার প্রিয় আর বড় বিশ্বাসী হাতিয়ার। তিলকা চেঁচায়, বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আমাদের ইলাকা থেকে।— ঘুরে পড়ে ক্লিভল্যাণ্ড। ছত্রভঙ্গ কোম্পানি ফৌজ। জয়োল্লাসে ধ্বনি ওঠে হুল্ হুল্।

অগস্ট ক্লিভল্যাণ্ডের মৃত্যু ১৩ই জানুআরি ১৭৮৪ সাল। ভাগলপুরে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক। কে এই তিলকা মাঝি? কোম্পানির সাহেব মহলে বিভ্রান্তি। তিলকা মুর্মু আর তিলকা মাঝি দুটো নাম কেন?

আর কোম্পানির একসালা বন্দোবস্ত, পাঁচসালা বন্দোবস্ত, দশ-সালা বন্দোবস্তের ফলে যে নতুন আর ভুঁইফোঁড় জমিদার ফৌজ তৈরি হয়েছে তারাও ছুটে এল। নাও নাও, হাতি ঘোড়া সেপাই বন্দুক নাও। তিলকা মাঝির জুজুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

ক্লিভল্যাণ্ডের সমাধিতে গভর্নর জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা হল। অসি তুলে নয়, ভালোবাসায় তিনি জয় করেছিলেন রাজমহল জঙ্গলসীমান্তের "ল-লেস্" বর্বর অধিবাসীদের। শিখিয়েছিলেন সভ্য জীবনের মর্ম। তাদের মন জয় করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

তিলকা ভেবেছিল ১৩ই জানুআরির যুদ্ধে হেরে গেলে কোম্পানি সরকার ঢুকে পড়বে জঙ্গল এলাকায়।

তিলকা জানত না, জিত হোক বা হার হোক, কোম্পানি সরকার ঢুকবেই জঙ্গল এলাকায়। ১৭৭৭ সালে শেষ পাঁচসালা বন্দোবস্ত। এখন চলছে দশসালা বন্দোবস্ত। আর ১৭৮১ সালে হুম করে বাংলার রাজস্ব আরো ২১ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে কোম্পানি। বাড়তি-রাজস্ব তুলতে হলে যত জমিতে লাঙল চলে, তার শেষ ছটাক জমিও খাজনা আদায়ের আওতায় আনতে হবে। তাই দরকার তিলকাদের নিঃশেষ করা। তিলকা! জানত না, ১৭৮০ সাল থেকে মহীশূরে হায়দার আলি ফরাসীদের সহায়তায় ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন। হায়দারের বিরুদ্ধে সেনা পাঠাতে উড়িষ্যার দখল চাই। উড়িষ্যার দখল মানে মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের জমিদার ও অধিবাসীদের অনুগত রাখা চাই। সব চাই কোম্পানির। অথচ মেদিনীপুর ও বীরভূমের জঙ্গলমহালে চলছে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ১৭৮০-র দশকে —বিদ্রোহের দশক এটি। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ শেষ হয়নি। হেস্টিংস কি করে রাজমহলের আর ভাগলপুরের মাঝামাঝি জঙ্গল এলাকায় সাঁওতাল আর পাহাড়িয়ার একজোট সইতে পারেন? হুল কি করে চলতে দেন?

বাঁটুল দিয়ে সাহেবকে মারা কি সম্ভব?—হেস্টিংস জানতে চেয়ে-ছিলেন। তারপর বুঝেছিলেন তা খুবই সম্ভব। কেন না ক্লিভল্যাণ্ড মরে গেছে।

সেনাবাহিনী পাঠাও, পুলিস মোতায়েন করো গ্রামে গ্রামে।

গভর্নর জেনেরালের ইচ্ছাই আদেশ। ফৌজ ও পুলিসবাহিনী। মার্চ, মার্চ, মার্চ। সর্জনের মত ঘাটোয়ালরা সঙিনের খোঁচায় বাতিল। এখন আর মার খেয়ে বা মেরে সরে যাওয়া নেই। গ্রামে গ্রামে পুলিস, হাতে হাতে বন্দুক। আদিম সে প্রাকপুরাণিক শ্বেত রাজহংসীর সন্তানরা আবার যাযাবর হবে। ইতিহাস তাই চায়। আর কোম্পানির

ফৌজ ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। ভাগলপুরের নতুন কলেক্টরের হুকুমত—সাঁওতাল মাত্রেই বিদ্রোহী। দেখলেই গুলি করবে।

তিলকাকে ধরিয়ে দাও, তার অনুচরদের ধরিয়ে দাও। তাকে ধরিয়ে দিলে খালাস পাবে।

গ্রামে গ্রামে স্বামী স্ত্রীকে, বাবা ছেলেকে, মা মেয়েকে, ভাই বোনকে, হাতে হাতে বেঁধে দিতে থাকল শাল ছালের রাখী। পরগনাইত ও দেশ-মাঝিরা তিলকাকে বলল, এই ভালো হল তিলকা। ধরায়ে দিলে ভি খালাস দিবে না। মেয়েছেলে, বুড়ো বাচ্চা, যত পারি লুকায়ে রাখি, দূরে পাঠাই। নিজেরা হাতে শালগিরা বেন্ধে যত পারি লড়ি, নয়তো মরি। তুই ভাবিস না কিছু।

আমি ধরা দিই।

না। সমাজের মাথার ইজ্জত নামাতে দিব না।

মহরা, তিলকার শ্বশুর, তিলকার হাত ধরে বলল, আজ বুঝতেছি, এমনই কোনো চিলিমিলি, কোনো কোম্পানি তখনো ছিল রে। নয় তো আমরা এক দেশে যাই, এক দেশ ছাড়ি কেন? তাই বলি নিশ্চয় ছিল।

আমার বুক ভেঙে যায়।

না তিলকা না।

এত এত মরণ।

নিয়মে সামাজ দেওয়া হল না, এই তো? দেবতারা সব জানছে। তারা দোষ নেবে না।

মনসার বাবা পাহাড়িয়া সর্দার নেমে এল এই সংকটকালে। সোমীকে বলল, জননী গো আমার ঘরে চল। বউ নাতি নাতনী নিয়ে চল। গ্রামের সকল মেয়ে শিশু নিয়ে চল মা। মেয়েদের ধরম কোম্পানি রাখে না।

তিলকা বলল, তুমি নেবে ওদের? কোন্ ভরসায়? এ যে বড় ভার নিচ্ছ।

তাই নিতে হবে বাপ।

কি ভরসায় ?

ভরসা এই তুই হাত। আমাকে গিরা বেঁধে দে তিলকা। মনসার বাপ হই আমি, তোর বাপের সমান।

মনসার বাপের হাতের গিরায় তিলকার চোখের জল। সোমী, রূপা তিলকাকে একবার ছুঁল, কপালে হাত বুলাল। তারপর গ্রামের সব মেয়ে, সব বুড়োবুড়ি আর শিশুদের নিয়ে চলে গেল একবারও পিছনে না চেয়ে।

হারা শুকনো গলায় বলল, যে যেমন পারে পালাচ্ছে। সমান জমিনের গ্রামে গ্রামে।

তিলকা বলল, জানি।

তারপর বলল, মনে রাখিস হারা এখন যা বলি, তোরা সবাই শোন, বাঁচিস যদি মিলিয়ে নিস। এখানে সাঁওতাল থাকবে না।

কেন ?

স—ব চলে যাব দিকে দিকে। কত বড় ভুবন রে, আগে জানি নাই এখন জানব। কোম্পানির ফৌজে জানাল। আমরা যাব পূর্ণিয়া, চম্পারণ, সিংভূম, ধানবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, কোথা চা-বাগান—কোথা কয়লা খাদান্। যেথা যাব, সেথাকার মানুষের পূজা-পরব ঢুকে যাবে মোদের সমাজে। মোদের রীতকরণ তারা নিবে।

কবে, তিলকা, কবে ?

তোরা জানবি।

তুই জানবি না ?

আমি ?—তিলকা হঠাৎ হাসল। বলল, নিজের গ্রামের মা-বিটি-বউ-বোন বাঁচল। অন্য গ্রামে ? চল্ চল।

কোথায় কি ছিঁড়ে গিয়েছে তিলকার। এখন সে ঝড়ের মেঘ, এখন সে উল্কা। এখন তার সঙ্গে কয়েকশো লড়াকু মাত্র। তোমরা

ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে যাও। বউ-মা-বোন-বিটি-বুড়াবুড়ি-ছেলে-পিলা নিয়ে পালাতে পার, পালাও। নয় তো তাদের পালাবার ব্যবস্থা কর। আর লড়ো, আস লড়ো।

এ ভাবেই চলল এই আশ্চর্য আর প্রথম হুল্। আর যখন এক বছর হয় হয়, তখন "হো, তিলকা হো!" বলে এসে পড়ল দুশো পঁচিশ লড়াকু পাহাড়িয়া। বহোত দূরে পাঠিয়েছিল ওদের এই পাহাড়িয়া সেপাইদের। বহুজন মরে গেছে হায়দরের যুদ্ধে। যারা আছে, তারা ফিরে এসে গ্রামে ফিরে দেখেছে গ্রামগুলি শ্মশান। তিলকা মাঝির খোঁজে পাহাড়িয়া গ্রামেও ঢুকেছিল ফৌজ। সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে জানা নেই।

আমরা ফৌজে গিয়ে ওদের জন্যে লড়ব, ওরা আমাদের গ্রাম শ্মশান করে দেবে? তিলকা! তুই তো আছিস তোর সঙ্গে শামিল হয়ে এর শোধ নিব।

চল্ তবে।

কোথায় যাবি?

তিলকপুরের জঙ্গলে। ভাগলপুর হতে কোম্পানির ফৌজ ওই পথেই যায়।

তিলকপুর জঙ্গলের আড়াল থেকে যুদ্ধ চলেছিল। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

একদিন খাবার ফুরাল।

একদিন ফুরাল তীর।

তিলকা বলল, নতুন করে গিরা বেঁধে ভাই! টাঙি-কুড়াল হাতে বেরিয়ে পড়ি।

জঙ্গল নিঃশব্দ। বাইরে বেয়নেট ও বন্দুক প্রতীক্ষা করছে। বেয়নেট ও বন্দুকের ধৈর্য সীমাহীন।

গিরা বাঁধতে বাঁধতে তিলকা হাসল। নিচু গলায় বলল, ওরা ভাবছে আমি মরে গেছি। যদি মেরে বেরোতে পারি, ফের তিতাপানি জঙ্গল।

হ্যাঁ তিলকা।

গ্রামগুলো পাহাড়ের উপর নিয়ে যাব।

তাই ভালো।

পাহাড় ঢালে চীনা ধান এমনি করে ছড়াব।—তিলকা মাটি আঁচলা থেকে ছড়াল। বলল, চাষেবাসে মনটা বসে।

চল্।

হু—ল্ বলে চেঁচিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে ক্ষ্যাপা বানের মত ওরা বেরিয়ে এসেছিল। বন্দুক আর বেয়নেট। টাঙি আর কুড়াল। ফৌজের সমুদ্র যেন, ঘিরে আসছে, ঘন হচ্ছে। হারা গেল, ত্রিভুবন। আরো ঘন হচ্ছে। তিলকা টাঙি চালাচ্ছে। সব জানছে তিলকা। সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সবাই দিকে দিকে চলে যাবে। হুল্‌টা যে হল না? রাজমহলের মাটিতে তিলকা রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। হুলের বীজ ছিটিয়ে যাচ্ছে। লালন করবে কে? কে সে হুল্-এর ফসল ঘরে তুলবে? সে তিলকা নয়! সে কে?

কপালে কি বিঁধল। কিসের খোঁচা কাঁধে। তারপর উন্মত্ত চীৎকার, ও তিলকা নয়, আমাকে ধরো।

তিলকার হাসি পেল। কে তাকে বাঁচাতে চাইছে? হাসির সঙ্গে উঠে এল রক্তাক্ত ফেনা।

ভাগলপুর বাজার। অসাড় রক্তাক্ত তিলকাকে কোড়া মারা হচ্ছে। দর্শক পালাচ্ছে। চাবুকের কি শোঁসানি। তিলকা ঘোলাটে চোখে চাইল, বিস্মিত। কিন্তু হুল্‌টা হবে। ভিতরে ভিতরে তিলকা জানছে।

ঘোড়ার পায়ে বাঁধা তিলকা। ঘোড়া ছুটছে, তিলকার শরীর ছেঁচড়ে যাচ্ছে। নেই, চেতনা নেই। চেতনা আসছে যাচ্ছে। ঘোড়া থামল।

এখনো কথা বলতেই চেষ্টা করছে?

আরে, কথা বলছে।

কি বলছে? কে বোঝে ওর ভাষা? এই ভাঙ্গি, তুই বুঝিস্? যা, কাছে যা! শোন।

শান্তি, বিশাল শান্তি। 'তিলকার সামনে আনত একটি কালো বেদনা-দীর্ঘ মুখ।

কি বলল ?

কিন্তু হুল্‌টা হবে।

হুল্‌ ?

হাঁ সাহেব।

হুল্‌ কি ?

বলোয়া।

বলোয়া। বিদ্রোহ। এখনো বিদ্রোহ! হ্যাং হিম হ্যাং হিম হ্যাং হিম।

ভাগলপুরে বটগাছে বাবা তিলকা মাঝির রক্তাক্ত শরীর ফাঁসিতে ঝোলার জন্য জহ্লাদ মেলে না কিছুতে। শেষে এক ইংরেজ সৈন্য উঠে এল।

ভাগলপুর। ১৭৮৫ সাল।

॥ প্রেতোৎসব ॥

শহর থেকে রাজাপুর গ্রাম বড় জোর চার মাইল দূরে। রাজাপুরের রাজাবাবু এতদিন উজির ছিলেন। অগাধ জমিজমা তাঁর, টাউনে ঝলমলে বাড়ি। রাজাপুরে তাঁর ভাই-ভাইপো অনেক জনের বাস। চারদিকের হা হা রুক্ষতা আর গরিব গ্রামগুলির মধ্যে রাজাপুরের সবুজ ধানক্ষেত, বর্ধিষ্ণু বাড়িটি খুব বেশি চোখে পড়ে। সবাই বলে রাজাবাবুর বাড়ি।

রাজাবাবুর কানেই গিয়েছিল কথাটা। শুনে তাঁর ভাল লাগে নি। গ্রামে এসে তিনি ভাইকে বললেন, এ কি শুনছি?

—কি, মণির কথা?

—আঁ্যা, সে না কি জমি পেয়েছে, ছেলেরা তেল কলে কাজ পেয়ে গেল?

—ওই অশোকের জন্যে হল।

—বুঝলাম। তা কি পেল, ডাহি?

—না, সোল।

—বল কি।

—আর কি বলব? বলার আর আছে কিছু? খাল পাড়ে ভালো জমিই পেল।

—কতটা?

—ওই ভূমিহীনদের যেমন দিচ্ছে।

—খাস জমি, ঘরের ধারের জমি—তোমার ঘরের মুনিষ-মাহিন্দার ছিল না?

—হল না। অশোক কি কলকাঠি টিপল তা অশোকই জানে। জেলারো বলল, কেন বাবা মুনশিরাম! যিনি তোমায় মাহিন্দার

রেখেছেন, তাঁকেই বল না কেন পাঁচ বিঘা দিতে। তাঁর জমি তো ভেস্ করার উপায় নেই। তোমাকেই দিক। আমার কি রাম পেল না শ্যাম পেল, আমার কি! পার্টির ছেলে অশোক, সে বলেছে, দিতে হবে।

—অশোক কি বুঝাচ্ছে মণিদের?

—তার তো মুখে অন্য কথা নাই। রাজাবাবু তোর আমার জাত নাই আর। সে এখন মালিক শ্রেণীর লোক। কেউ যদি বলে, সে সাঁওতাল তোরা ভি সাঁওতাল, কিন্তু সে মনিব আর তোরা চাকর কেন? উত্তর দিবি, সে যখনই উজির হল, টাকা বাগাল, জমি বাগাল, তখনি সে—

—বুঝেছি। "সে অন্য শ্রেণীতে গেল।"

—হ্যাঁ, তাই বলে।

রাজাবাবু, এবং তাঁর শিক্ষিত কলেজ অধ্যক্ষ ভাই পরস্পরের দিকে তাকান। রাজাবাবু গভীর নিশ্বাস ফেলেন। বলেন, বসি খানিক।

বসে, জিরিয়ে, হাওয়া খেয়ে রাজাবাবু বলতে থাকেন, এ সবই হল হাওয়াবদলের কুফল। আদিবাসীর মনে হিংসা ওই অশোকের মত বিচ্ছু ছেলেরা ঢুকাচ্ছে। তারা আমার শহরের বাড়ি দেখে, ছেলেমেয়ে কৃতী হয়েছে তা দেখে, গ্রামের জমিজমা দেখে।

আবার নিশ্বাস ফেললেন তিনি। বলেন, একথা একবার ভাবে না যে, আমার যা আছে, অন্য জাতের তার তিন ডবল আছে। তোমরা শহরে বাড়ি করতে পারতে, জমিজমা বাগাতে পারতে, কোনো দি—ন দেশের সেবা করলে না। এ কি বলে অশোক, আমি তো তার কথাই বুঝি না। এত শ্রেণী চেতনা, শ্রেণীবিভাগ কেন? আমাদের রাজনীতিতে এত শ্রেণীর কথা ছিল নাই বাবু। এখনো নাই। এমন হিংসাও নাই।

—কে সে কথা বুঝে?

—আমি অন্য শ্রেণীর লোক? কিসে? পূজাপালা মানি না?

নায়কের মান দেই না? মকর-করম-সোহরাই কোনটা মানি না? বাপু রে! কপাল খণ্ডায় কে? কপাল দোষে মুনশিরাম আমার কাছে মান্দার খাটে আমি তার মনিব হয়েছি কপাল গুণে।

—অশোকরা তা শুনে না।

—ওরাই অন্য শ্রেণীর লোক হয়েছে। যাক, এখন জমির কথা বল।

—আর জমির কথা! মণি জমি পেল, তার ছেলেরা তেল কলে কাজ পেল। এখন সে আমাদের মানবে কেন? গ্রামে বাস, দাপ না রাখলে চলে না। তোমার উজিরী আমলে পেল নাই, এখন পেল।

—তাতে মণি গরম দেখায় খুব?

—গরম দেখায় না। তবে ধারকর্জ নিয়ে চলত, সে আর নিচ্ছে নাই।

মণির ঠাকুরঠুকুর, পজাখান?

—তাই নিয়েই আছে। সে বুড়া মানুষ, তাই নিয়েই আছে। গরম উঠেছে তার মেয়ের।

—কার? মণির মেয়ে রজনীর।

—তার। খুব গরম। ক্ষেতের ধান উঠতে কত নাচ, কত গান, চালের গুঁড়া কত বিতরণ।

—রজনীর ছেলে আছে না?

—আছে।

—তার বর? সেই ডাক্তার বলি যাকে।

—সে সাতে পাঁচে নাই। রজনীকে ভালবাসে খুব। আর রজনী যা বলে, তাতেই "হ্যাঁ" বলে।

—মণির ছেলে সোমরাই?

—সে চুপচাপ আছে। তবে পথে দেখলে যেন দেখে নাই এমন ভাবে চলে। আর দেখলে পরে "পরনাম হই বাবু" কথাটা যেন কোঁথ পেড়ে বলে। আর হাত দু'টা কপালে ঠেকায় যেন কত কষ্টে ঠেকায়। এতেই বুঝ, গরমটা উঠেছে কি উঠে নি।

—দেখতে হচ্ছে।

—আর একটা কথা!

—কি?

—এই লখিন্দরের ব্যাপার তো আমি ভাল বুঝি না। জানা চেনা মানুষ, সম্পর্কও আছে একটা, জমি তোমার সঙ্গে যাবে না। আমার দোফসলী জমিটা ওর ওই চার বিঘার জন্যে খিঁচ হয়ে আছে। এক রকম ধরেই নিলাম যে তোমার পরে বউকে টাকা দিয়ে ধর্মপথে কিনে নেব ওটুকু। তা তুমি আবার এক মেয়ে পুষ্যি নেবে, তাকে দিয়েথুয়ে যাবে, এ কি ঝামেলা?

—বিষম ঝামেলা।

—কি উপায় হয়?

—তুমি যদি কোনো কথা না বল আর যা করি তাতে সায় দিয়ে চলো, তাহলে উপায় হয়।

—কি উপায়?

এ সময়ে ক্ষিরোদবাবুর চোখ স্বপ্নে মধুর হয়। সে বলে, যা করতে হবে তা বুঝে শুনে।

—সে তো বটেই।

—ভুল করেছ কি মরেছ।

—আর ভুল করি।

—মাতঙ্গকে কোনো কথা জানাবে না।

—ধুর! মাতঙ্গকে আমি বিশ্বাস করি? রাজনীতিতে নাই, পার্টি কর না, বয়েস অনেক, সমাজের ভাল করবার তরে কোমর বাঁধ কেন?

—সে কি ঝাড়খণ্ড করে?

—কোনো দিন নয়। তার নিজখণ্ড নিয়ে তার সময় নাই। কোথায় কার জমি উচ্ছেদ হল, কে লোন পেল না, কোথা জল নাই, বেটা সাইকেলে ঘুরে কত! তোমার এ জ্ঞান হল না যে আদিবাসী যখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, তাকে সকলে সন্দেহ করে?

—আমাকে শুনাল খুব, আপনারা টাউনে আর তামাম মহল্লায় যত রাজ্যের "কল্যাণকর" সমিতি ঢুকাচ্ছেন কেন? কিসের কল্যাণ? সে বেটাদের তো দেখি লাখ লাখ টাকা, আর কাজ দেখি একটাই। হেন সভা ডাক, তেন মিটিং কর, আর টাকা দিয়ে দিয়ে গরীবকে শিখাও যে বাপু হে, তোমরা আর যা করো, দল বেঁধ না। দল বাঁধা বড় মন্দ কাজ। এ বেটারা গুপ্তচর, জানলেন?

—এ কথা বলছে?

—খুব বলছে।

—তুমি কি বললে?

—আমি বললাম, কার গুপ্তচর? মাতঙ্গ বলে, ওদের যারা টাকা দিচ্ছে সে সব বিদেশের গুপ্তচর। আমি বলি, বাপু! বিদেশে ভাল মানুষ থাকে। ধনী দেশের মানুষ গরীব দেশের কল্যাণ করতে চায়। তাতেই এত সমিতি গড়ে দিচ্ছে। এ কাজে মন্দ দেখ কেন?

—যার মনে মন্দ, সে মনে মন্দ দেখবে। দেশে শাসন নাই? সরকার নাই? সরকার জানে না, যে কোন দেশ সমিতি গড়ে দিয়ে টাকা দিচ্ছে?

—অশোকদের বচন তো অন্যরকম।

—সে আবার কি বলে?

—বলে যে তোমারও হাত আছে এতে। তোমার আমলেই তুমি বুঝেছিলে যে এই জঙ্গলটঙ্গল নিয়ে আন্দোলন জোরদার হবে। তাতেই এরা যাতে এসে বসে, সে জমিন তৈরি করেছিলে।

—সবেতেই আমার হাত দেখে।

রাজাবাবু খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কি কি তিনি করেন নি, সে কথা তিনি হরদম শোনেন। এই অঞ্চল থেকে তাঁকে উজির করা হয়। হ্যাঁ, তিনি পথঘাট, জলের ব্যবস্থা, জমির ব্যবস্থা, করেন নি। এ কথাও সত্যি যে লোধা-বিরহড়-পাহাড়িয়া এদের জন্য করেন নি কিছু।

সেই কি সব? জীবনে চিরস্থায়ী বলে কিছু আছে না কি? পথ-

ঘাট কালে ভেঙে পড়ে, দীঘি মজে যায়। জমি? রাজাবাবু তো রাজনীতি করেছেন। তিনি কি দেখেন নি যে বছর বছর আইন পাস হয় আর দশকে দশকে সমানে ছোট চাষী জমি হারায়? তা যখন হয়, কালের গতিতেই হয়। তিনি কে, যে কালের অমোঘ গতিকে বাধা দেবেন? লোধা-বিরহড়-পাহাড়িয়া? না, আদিবাসী হলেই আদিবাসীর উপকার করতে হবে এমন সংকীর্ণতা তাঁর নেই।

বেশ, এ সব না হয় করেন নি। যে সব কাজ করেছেন, সে কথা তো কেউ বলে না? কত কত সভার-সভাপতি হয়েছেন, কত মিটিং উদ্বোধন করেছেন, কত জায়গায় লাল ফিতে কেটে দরজা খুলেছেন, কম করে নিশ্চয় হাজারটা মাল্যদান করেছেন। এও তো একটা সম্মান রে বাপু! বুঝে দেখ।

—অশোক তা হলে খুব জ্বালাচ্ছে?

—খুব।

—একেই বলে ঘরের শত্রু। বিশ্বাস করতাম, সাথে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম।

—এবার দেখতে হবে।

—কি আর দেখব। উনআশি সাল চলে এল। মনে হয় এ রাজত্ব বুঝি টিকেই গেল।

—তোমার কি এল গেল?

—হ্যাঁ, তবে এ কথা বলতে হবে যে কলকাঠি আমরাই ঘুরাই। ক্ষমতাও রাখি।

—তবে?

—বউমা মানে চরণের বউ এখন কেমন?

—মায়ের কাছে শোন।

ক্ষীরোদের মা, রাজাবাবুর খুড়িমা ধীর পায়ে এসে দাঁড়ান। তাঁর একটি চোখ পাথরের। বসন্ত রোগে চোখটি চলে যায়। জ্যান্ত চোখটি ক্ষুরের মতো ধারালো। সবাই বলে, রাইমণির চোখ না কি দৈবী

ক্ষমতা ধরে। যা কেউ দেখে না, তা রাইমণি দেখেন। সাধারণ, গরিব গুরবো লোক ওঁকে ভয় পায়। কেন, মঙ্গলার ছেলেকে সাপে কেটেছে শুনেই উনি বলেন নি, যে "হাসপাতালে নিলেও বাঁচবে না যখন, তখন রাতটা রাখো, সকালে নিও?" অবশ্য রাতে সাপে কাটা রুগী রাজাপুরের লোক জোড়া সাইকেলে মাচা বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাতে ডাক্তার রোগী দেখেনি, সকালে দেখল যখন তখন রোগীর হয়ে গেছে, এও তো সত্যি হল?

রাইমণি বললেন, বউমার রোগ হয়নি।

—কি বল গো?

—রোগ হলে সারত। ছেলে হলে সূতিকা হয়, অসুধে সারে। আমার ঘরে পূজাপালা, আমার ঘরে তুমি। তবু বউ সারে না কেন?

—কেন সারে না বল?

—কে ওকে ডাইন করেছে?

—ডাইন?

—হ্যাঁ বাছা। ডান-ডাইনি এই গ্রামেই আছে। ডান-ডাইনি লোকে এমনি এমনি করে না, হয়ও না। শত্তুরতা মনে পুষলে তবে লোকে ডাইন হয়।

এ কথায় রাজাবাবুর মনের অতলে কোনো প্রাগৈতিহাসিক সাপ নড়াচড়া করে। মণি, মণির ছেলে সোমরাই, লখিন্দর আর তার বউ। ডান-ডাইন হবার লোকের কি শেষ আছে? মণি এ আমলে খাস জমি পায়, সে ডাইনি। সোমরাই এক বেকার ছেলে তেলকলে চাকরি পায়, সে ডাইন। লখিন্দর তাঁর জমির একটানা লপ্ত ভেঙে মাঝে বসে আছে। সেই জমির খোঁচাটা কায়েম রাখার জন্যে একটা মেয়েকে পালপোষ করা, সে মেয়েকে বোর্ডিঙে রেখে পড়ানো, মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে জমি দেবার ইচ্ছে রাখা, লখিন্দর ডাইন!

আছে, আরো আছে। মণিদের পাড়ার আরো আরো ভূমিহীন

লোকগুলি আছে। অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকগুলি আছে। অশোকের মত ছেলের চেলারা আছে না? ডান-ডাইন অনেক।

—কাকী, তুমি ঠিক বলছ?

—বিশ্বাস কর না? নবযুবতী মেয়ে তো ঘরেই আছে, মাধবী আর শেফালী। কলেজে পড়ে, ঘরে থাকে। তাদের মুখ দিয়েই ডাইনের নাম বেরোবে।

—ডাইন

—হ্যাঁ, ডাইন!

ক্ষীরোদ সোল্লাসে বলে, বলি নাই দাদা? কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাতে জানতে হয়।

—আমাকে ভাবতে দাও।

রাজাবাবু রোগিনীর ঘরের দরজার দাঁড়ায়। চরণের বউ, সেও শিক্ষিত মেয়ে। চরণ সরকারী কর্মচারী। ক্ষীরোদ এক কলেজের অধ্যক্ষ। কাকা, রাইমণির স্বামী বিশ্বনাথ অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ। আরেক জেঠতুতো দাদা তারানাথ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। এমন রমরমা মানুষ কি সহ্য করতে পারে?

কচি বউটা বিছানায় মিশে আছে। রাজাবাবুর মনে বিজাতীয় রাগ জমতে থাকে। ভাল গাছটার গোড়ায় পিঁপড়ে? তরতাজা মানুষকে বিষ ঢেলে ক্ষয় করা? এ কি সহ্য হয়?

বাড়ির লোকগুলি পিছনে এসে দাঁড়ায়।

চরণ বলে, কি আর দেখ দাদা।

রাজাবাবুর চোখ লাল হয়ে ওঠে। তিনি গর্জে ওঠেন। আজও আমি ক্ষমতা ধরি। দরকারে দিল্লি অবধি দৌড়াতে পারি। যে এমন করেছে তার লাশ ফেলে দিব নালায়। কাগজকলের পচা গন্ধে লাশের হদিস থাকবে না।

বিশ্বনাথ, তারানাথ, ক্ষীরোদ, চরণ, সকলে সকলের দিকে তাকায়। তারপর বিশ্বনাথ বলেন, রাগের বশে কাজ করতে নাই। আর কি

করব তা ঘোষণা করতে নাই। দেয়ালেরও কান থাকে। দেখ! ধর্ম-পথে আমরা আছি, আমাদের জয় হবে।

এ সময়ে রোগিনী নড়েচড়ে ওঠে ও পাশ ফিরতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে বলে, ও বাবা, গো! মরে গেলাম গো, মেরে ফেল্‌ল।

রাইমণি বলেন, বাণ মারছে আর কি।

রাজাবাবু বলেন, বাণ আমিও মারব। তবে হ্যাঁ, যা করব, সমাজকে সাথে নিয়ে করব।

সবাই এ প্রস্তাবে সায় দেয়।

—চল্, বড় ঘরে চল সবাই।

বড় ঘরে বসে রাজাবাবু বলেন, খুব হিসাব করে কাজ করতে হবে। শোন—

সবাই শোনে, রাজাবাবু বলেন। রাজাবাবুর দরকারে ডাইনি তৈরি হতে থাকে।

॥ ২ ॥

অশোক চেঁচাচ্ছিল, আমরা চিন্তায় আধুনিক হতে পারি না, এই হল আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত হয়, চাকরি পায়, সে অবধি সমাজের নিচুতলার মানুষদের কথা ভাবে না। ধানজমি আর গরু, গরু আর ধানজমি। এটা চিন্তার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা নয়? এগোতে হবে, আধুনিক হতে হবে, চিন্তার দিক থেকে আধুনিক, আজকের সময়ে পৌঁছতে পারলে অনেক হবে।

মণি উঠানে কলাই শুকোচ্ছিল। প্রথমত কানে সে একটু কম শুনছে। তা ছাড়া তার মনপ্রাণ এখন ক্ষেতের কলাইয়ে। নেড়েচেড়ে রোদে দিয়ে তার আশ মেটে না। নিজের জমিতে চাষকরা কলাই, এ কি কম জিনিস? সার্থক, সার্থক পুজাপালা করা সার্থক

মণির। অ বাবা, ভূমিহীনে জমি দেবে না? অ বাবা! একথা বলে বলে মুখে ফেনা উঠে গিয়েছিল যাকে বলে। তারপর, ওই অশোক, সেদিনের ছেলে, তাকে মাতঙ্গ বলল, কিছুই পার না অশোক।

—কি পারি না?

—মণির মত কয়েক ঘর। এদের জমি হয় না? এদের জন্যে তো কথা শুনি বড় বড়।

—তুমি জান না দাদা? ভূমিহীন ভূমি পাবে এই প্রোগ্রাম ভাঙিয়ে রাজাবাবুর মত লোকরা নিজের লোকজনকে চতুর্দিকে বসিয়েছে? পায়নি একা মুনশিরাম। আর সব ভূমিহীনের নামে নামে জমি। সব তাঁর দখলে। বোকার দলকে কিছু টাকা দিয়েছে আর "আমার হাতে থানা পুলিস, আমার হাতে দিল্লী" বলে চোখ রাঙিয়ে বশে রেখেছে।

—বেশ! রাজাবাবুর কথা সবাই জানে। এখন তো বাপু তার সরকার নাই? সব মন্দ তারা করেছে, তোমরা বলো। বেশ! তর্কে কাজ নাই। তা তোমরা সব ভালো না করতে পারো, কিছু করো।

—সেই জন্যেই তো—বলে অশোক চুপ করে যায়। তারপর সে অবশ্য রাজাপুরের সকল ভূমিহীনের নাম দিয়ে দরখাস্ত দিতে চেয়েছিল। অন্যেরা ভয় পেল। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ কে করে? রাজাপুরে বাস করে যে ভূমিহীন সে সরকারের কাছে এক ছিটে জমি পেলে তারানাথবাবু গরম হবে, বিশ্বনাথবাবু গরম হবে, রাজাবাবুর কানে খবর যাবে। ও বাবা, সে লোক হাতের মুঠোয় দিল্লী রাখে।

কেউ সাহস পায়নি, একা মণি ছাড়া। মুনশিরামের বুদ্ধি চিরকালই কম, সেও গিয়েছিল।

অশোকের চেষ্টায় জমি। মাতঙ্গের চেষ্টায় ছেলেদের চাকরি।

মণি সেই থেকে অন্য মানুষ হয়েছে। আজ অশোক আর মাতঙ্গ তার ঘরে এসে বসেছে, নিজেরা কথা বলছে, সে কথা মণি আগে শোনেনি।

এখন সে বলল, কি রে অশোক কি বলিস? খালি বলিস পৌঁছাতে হবে?

—আধুনিক যুগে!

—সে আবার কোথায়?

—তোমার মাথায়।

—না বাবু, সেথা আমি পৌঁছতে পারব না। যখন বয়স ছিল তখন নামাল খাটতে গিয়েছি সে—ই মুর্শিদাবাদ। তারপর আকালের সময়ে গেলাম হাওড়া। এখন বুড়ো বয়সে আর কোথা যাব? সম্ভব!

—আর কোথা যাব। আমি কি বলি আর তুমি কি বোঝো। আধুনিক যুগে পৌঁছতে হবে বলছি!

মাতঙ্গ খুব মন দিয়ে কি লিখছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, ঘরে শান্তি নাই, রেডিওর কঁ্যাচরম্যাচর। চার মাইল ঠেঙিয়ে এলাম এখানে, তাতে তোমার চীৎকার। তা তুই যেয়ে আধুনিক যুগে পৌঁছা না কেন? তা বাদে আমাদের নিয়ে যাস। ছোঁড়া জানে চেঁচাতে।

—এ সব কথা বলতে হবে না?

—তোর তো জ্ঞান বিস্তর! এরা কি করল যে এদেরকে তুই হেন করতে হবে তেন করতে হবে, বলছিস? নিজেই তো বললি শিক্ষিত যে হয়, সে সমাজকে দেখে না। শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষিত হয় না, আর যাদের অশিক্ষিত ভাবিস, তারা অশিক্ষিত সত্যি অর্থে নয়।

—তা বললে মানব কেন?

—মানবে না কেন বাপু? এদের অসুখে ডাক্তারের কড়ি যুয়ায় না, ধনরাজ মাহাতোর কাছে ছুটে। তুমি বলবে ধনরাজ ডাক্তার নয়। সে তো বলে নাই যে সে ডাক্তার। সে জড়িবুটি করে, তাও লুকায় নাই। তবে বল, এরা অশিক্ষিত বলে সেখানে যাচ্ছে?

—তা হলে দোষটা কার? এতকাল যারা—

—এ দেখি মহা মুশকিল। কার দোষ কার গুণ কি বিচার

করবে? সরকার বদলে কি হয়? সেই সরকার তো নাই। তাতে রাজাবাবুর, শশীবাবুর, লালমোহনবাবুর ক্ষমতা কমেছে কিছু?

—সে দাপ নাই।

—সময় এলে বুঝিয়ে দেবে।

—ব্যাপার হল যেয়ে কি জান? সে তুমি যতই বল রে ভাই, পাঁচজনা আম খায়, পঁচানব্বই জনা আঁটি চাটে, এ অবস্থা আর ঘুচল নাই।

—তুমি যা বলছ, তাই তো হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভিশাপ।

—বটে! শাপ কাটবে কিসে?

—শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হলে।

—করবেটা কে?

—এরাই করবে।

—হ্যাঁ। আর আইন শৃঙ্খলা গেল গেল বলে পুলিস এসে ঠেঙাবে। তোর মুখে এত শ্রেণীসংগ্রামের কথা কেন রে ছোঁড়া। তোরা তো সকল আন্দোলনের গোড়া কেটে নাশ করেছিস। অতই যদি বুঝবি, তা হলে একটার পর একটা জালি সমিতি এসে খুঁটো গেড়ে বসে যায়?

—তুমি কি যে চাও আর কি যে বলো, কিছুই বুঝি না। রাজনীতিও করো না।

—ধুরো রাজনীতি। পেটে নাই ভাত, মাথায় নাই ছাতা, তা দেখে জীবন গেল, রাজনীতি করে।

মণি কলাই নেড়ে চেড়ে দিতে দিতে "ছাতা" কথাটি শুনল। শুনে একগাল হেসে বলল, কিনব, ছাতা একটা কিনব। ছেলেরা বলেছে মাইনে হলে ছাতা কিনবে।

মাতঙ্গ বলল, এখন কাজ করতে দেবে?

—কি করছ?

—পতঙ্গা গ্রামে কুয়ার ব্যাপারটা নিয়ে লিখছি। ব্যাপারটা

খারাপ হয়ে গেল খুব। জলের নাম জীবন বললে হয়। সেই জল কাকেও দিচ্ছে না মদনচাঁদ।

—চল, দেখা যাক।

—তোরা তো দেখিস না এ সব।

—দেখব, বললাম তো।

—প্রভঞ্জনের কাছে যাব?

—তার কাছে কেন?

—আমার এখন রোগীর নাভিশ্বাস। তার কাছেও যাব, তোমার কাছেও যাব।

—এরা আসতে এত দেরি করছে কেন?

—থাম থাম কি যেন বিবাদ শুনি?

মাতঙ্গ ও অশোক দাঁড়িয়ে পড়ে। মুনশিরাম আর প্রহ্লাদ দু'জনেই রাজাবাবুর মাহিন্দার। প্রহ্লাদ এই বিকেলেই মদ খেয়েছে খানিক। বছর আষ্টেক আগে তার নামে খাস জমি বিলি হয় এবং সে সময় রাজাবাবু তাকে কিছু টাকা দেয় জমিটির বদলে। সে জমির মালিক কোর্ট কাছারিতে প্রহ্লাদ, এবং বাস্তবে রাজাবাবু।

এই খেদ প্রহ্লাদের মনে থাকে। ভোর থেকে ভূতগত খাটুনি খাটে, বিকেল চারটা নাগাদ তার ছুটি হয়। তখন সে স্নান করে ভাত খায়। মাঝে মাঝে, হাতে পয়সা পড়লে সে যায় তাড়িখানা। আর নিজের খেদে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে।

প্রহ্লাদকে অনেকবার বলা হয়েছে, তুই খাটিস মনিববাড়ি। তোর বউ ছেলেমেয়ে কাঠ কুড়িয়ে বেচে পেট চালায়। যদি দুটো পয়সা পাস, তাড়ি খাস কেন?

—কেন খাব না? আমার ঘর যাবার পথে সরকার যদি তাড়িখানা ভাঁটিখানা বসাবার লাইসেন্স দেয় তবে আমিও খাব। পয়সাটা ভাঁটিখানায় দেব না বলে লাইসেন্স দিয়েছে?

—এ একটা জবাব হল?

—মাতঙ্গবাবু!

—ধুর। "বাবু" বলিস না।

—বেশ মাতঙ্গ দাদা! আগে বল, টাউনে এত ভাঁটিখানা দেখেছ?

—কাছে আসিস না বাপু।

—দেখেছ?

—না। দূরে থাক্ খানিক।

—আমি হেঁড়্যা বানাই, মৌয়া চুঁয়াই। তাতে দোষ হয়, হয় না?

—নে, বল্, বলে যা।

—খু—ব দোষ হয়। তাতেই তো সরকার অলিতে গলিতে ভাঁটি লাইসেন্ দিল। কাগজকলে কাজ কর, তেলকলে কাজ কর, মনিববাড়ি কাজ কর, পয়সা বাবু ভাঁটিখানায় দিয়ে যাও।

—তাতেই খাস?

—তাতেই খাই। আর খাই দুঃখে। বড় দুঃখ গো আমার। আমার নামে জমি, আমি সে জমিতে খাটি, ধান তুলি রাজাবাবুর খামারে।

এই হল প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ আর তার মত অন্য যারা আছে, তারা যদি সমবেত হয়ে জমির দখল দাবী করত, করবার সাহস পেত, তা হলে এ বিষয়ে কিছু করা যেত, এই হল অশোকের কথা।

প্রহ্লাদ বলত, সাহস যার নেই বলে জানছ, তাকে সাহস যোগানোর কাজ অন্যদের।

মাতঙ্গ বলত, এরা সাহস পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। এরা জানে যে এদের পিছনে কেউ নেই।

অশোক যখনি মাতঙ্গের মুখে এ সব কথা শুনেছে, তখনি ওর মনে হয়েছে যে মাতঙ্গ ওকে দোষী করছে। যেন বলছে, অসংগঠিত এই লোকগুলি কত দুঃখী তা দেখ। প্রবল মনিব রাজাবাবুর আর রাজাবাবুর পরিবারবর্গের এমন স্পর্ধা হয় কি করে? এত এত জমিজমা এ ভাবে রাখে তারা কি করে? এ লোকগুলির পিছনে কেউ নেই

তা জানে বলে তাদের এমন স্পর্ধা। এদের উপর যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিবিধান করতে পার, তা হলে তোমার মুখে শ্রেণীসংগ্রামের কথা মানায়।

অশোকের ধারণা যে মাতঙ্গ দাদা তাই বলতে চায়। এটা সে দেখছে যে মাতঙ্গ দাদা "শ্রেণীসংগ্রাম"। "শ্রেণীচেতনা", এ সব কথা পছন্দ করে না।

অশোকের অসহায় লাগে। মাতঙ্গ দাদা খুবই খাঁটি লোক। কিন্তু সে বাস্তব সত্যটা চেয়ে দেখে না কেন? দেখ দেখ মাতঙ্গ দাদা, সবটা বুঝে দেখ।

অবহেলিত অঞ্চল, জঙ্গলমহালী এলাকা, আদিবাসী এখানে বেশি। দীর্ঘকাল জায়গাটিতে রাজনীতিক আধিপত্য করেছে রাজাবাবুর দল। কাগজকল, তেলকল, আখমাড়াই কল, জঙ্গল কাটাই ঠিকাদারি ব্যবসা, এ সব কিছুতে ধনিক ব্যবসায়ী ও ধনী ভূস্বামীরা অনেক আগেই গেড়ে বসেছে। সব কিছুতেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল এক রাজনীতি রাজত্ব করেছে।

এমন এক রাজনীতি যেখানে, যেখানে কিছু বেজায় ধনী, অনেক উলঙ্গ গরিবের বাস, সেখানে গোটা আমলাতন্ত্র ছোট থেকে বড়, ধনীর স্বার্থই দেখেছে।

এরই পটভূমিতে আজ স্বাধীন জঙ্গলখণ্ড আন্দোলন গড়ে উঠেছে! হ্যাঁ, সমাজের খেটেখাওয়া গরিব মানুষের মনে এ আন্দোলন হয়তো আশা যুগিয়েছে। তারা ভাবছে, স্বাধীন রাজ্য হলে তাদের উপর শোষণ বন্ধ হবে।

এমন এক টালমাটাল অবস্থায় মাতঙ্গ দাদা! আমরা সরকারে এলাম। এখন তো যা নকশা হয়ে আছে, তাতে আমরা যে সৎ, আমরা যে লড়াকু, আমরা যে নির্ভীক, তা দেখাই কি করে বল দেখি? সেই পোকায় কাটা ঘুণ ধরা আমলাদের দিয়েই কাজ করাতে হয়। নেতারা বোঝে এক রকম। আমরা দেখি অন্য রকম। আমরা

দেখি অন্য ছবি। দুঃখদুর্দশা এত বেশি যে যা করো তা সাগরে শিশির বিন্দু হয়ে যায়। তবে তোমার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে!

আজ মণির বাড়ি এসেছে অশোক, মাতঙ্গের টানে। মাতঙ্গ সব সময়ে মণিদের উপকার করতে পারে না। তবু মণিরা ওকে আপনজন বলে বিশ্বাস করে।

এখন গণ্ডগোল শুনে মাতঙ্গ আর অশোক দু'জনেই এগোল। মণির ছেলে সোমরাই, আর রাজাবাবুর দুই মাহিন্দার মুনশিরাম আর প্রহ্লাদ, তিনজনে ঝগড়া করছে? না না, প্রহ্লাদ আর মুনশিরাম দু'জনে চেঁচাচ্ছে। সোমরাই আরো চেঁচিয়ে তাদের থামাতে চেষ্টা করছে।

—কি হল?

মাতঙ্গ চেঁচিয়ে উঠতে ওরা চমকে থেমে গেল। তারপর প্রহ্লাদ মত্ত গলায় বলল, কি হল বলছ কেন? খু—ব বিপদ হল।

—কিসের বিপদ?

—চরণবাবুর বউকে কে ডাইন করেছে।

—কি করেছে?

—ডাইন করেছে।

মাতঙ্গের চোখমুখ রাগে গনগনে হয়ে উঠল। সে বলল, কে বলেছে?

—রাজাবাবু, তার কাকা, ভাইরা।

—বলেছে? তুই শুনেছিস?

—নিশ্চয় শুনেছি।

মাতঙ্গ এগিয়ে গিয়ে প্রহ্লাদের গালে চড় মারল। বলল, তারা শিক্ষিত লোক, ডাইনের প্রচার দিচ্ছে? তুই বেটা মাতাল। কান শুনতে ধান শুনেছিস, যা তা বলিস?

—মারলে? মারলে আমায়?

—মারব না?

মুনশিরাম বলল, তারা বলছে আইন। এ শুনছে ডাইন। কত বুঝাচ্ছি যে এ কথা বলিস না।

—না গো! ডাইন বলেছে।

—বেশ বলেছে। যা, এখন ঘরে যা। মুনশিরাম তুই যা বাবু মনিববাড়ি। সোম্‌রাই বা ওদের মধ্যে গেলি কেন? তোর বুদ্ধি নাই!

—আমাকে ধরেছে দু'জনে।

—না না, এ সব কথা ভাল নয়। আর ডান-ডাইনি চাই না। এই ডাইন আর অপদেবতা আর মনসার ভয়, এ হতে খুনাখুনি হয়।

অশোক বলল, ডাইন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনলে না? এই সব বিশ্বাস থেকে সর্বনাশ হয়।

—এ তো কুসংস্কার।

—যত না সংস্কার, তার বেশি রটনা। নিজের জাতের উপর কম রাগ হয় আমার? "রূপান্তর" কাগজে ডান-ডাইনের রসাল গল্প বেরোল, তার একটা প্রতিবাদ হয় না? আদিবাসী মানেই হয় ন্যাংটা মেয়ের ছবি, নয় ডান-ডাইনি নিয়ে গাঁজাখুরি প্রচার?

—সত্যি কথা।

—আমি বললাম, তাতে মনে হল সত্যি কথা। কেন? যেভাবে আদিবাসী নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রচার হয়, তা দেখে লজ্জা করে না? প্রতিবাদ করার কথা মনে হয় না?

—যাক গে, মাতাল হয়ে কি বলেছে—

—না, আমি ভাল বুঝছি না। তুমি তো খুব "শ্রেণী" কথাটা বল। দেখতে পেলে শ্রেণীর ব্যাপার?

—কি দেখব?

—তিনজনই ছিল বাঁকা মানুষ। সোমরাই জমি পেয়েছে এক ছিটে। তাতে মুনশিরাম খাপ্পা, কেননা সে পায়নি। প্রহ্লাদ খাপ্পা, কেননা তার জমি তার বশে নাই, আর সোমরাই নিজের জমি ভোগ

করছে। প্রহ্লাদ আর মুনশিরামের আসল শত্রু রাজাবাবু। কিন্তু দুই বোকা ধরে নিয়েছে যে সোমরাই এখন তাদের শত্রু। এই তো সমাজ, এই তো সমাজের মানুষ, এদের ভাল করতে হলে অনেক কষ্ট বাকি।

—তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝ।

—ডাইনের হুজুক ভাল নয়।

—আরে ও কিছু নয়।

—তোমার বুঝতে অনেক বাকি আছে। আমার বিশ্বাস, প্রহ্লাদ ঠিকই শুনেছে।

—সে কি?

—দেখে নিও।

মাতঙ্গ ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ চলে। দু'জনেই সাইকেল ধরে হাঁটছে। পথ চলতে চোখে পড়ে লোধা পুরুষ ও মেয়েরা কাঠ বেচে দিনান্তে ঘরে ফিরছে। অশোক বলে,—

"করুণ হাতের ক্লান্ত কলস
কাঁপে দ্বিধা লজ্জায়।
স্বাধীন দেশের দাগী লোধা জাত
চিরদিন অসহায়
— — — — — — —
চুরি না করেও চিহ্নিত চোর
আজন্ম অবিচারে
জন্মগ্রহণ করা অপরাধ।
দরিদ্র লোধা ঘরে।"

সত্যি মাতঙ্গ দাদা। বেশ লিখেছে ভবতোষ দাদা, তাই নয়? লোধা হয়ে জন্মানোই এক অপরাধ।

—হ্যাঁ, খুব ভালো।

—এই রকম কবিতা খুব ভালো। বুঝা যায়।

—বুঝা তো যায় রে ভাই। কিন্তু লোধাদের দেখ, দাগ মেরে রেখে দিয়েছে। আট ক্লাস, নয় ক্লাস অবধি পড়েছে এমন লোধা ছেলে কি নাই ? তাদেরকে যদি ক্লাস ফোর পর্যায়ের চাকরিও দিত।

—তা বটে।

—নয় জঙ্গলে বনরক্ষীর কাজ দিত। বনজঙ্গল ওরা হাড়ে হাড়ে চেনে।

—ওদেরও এগোনো দরকার। চাইবে তো ?

—কেমন করে চাইবে বল ? ওদের পাশে কেউ আছে, যে সেই জোরে চাইবে ? আমার তো এক এক সময়ে মনে হয় আদিবাসী বলে জাদুঘরের জিনিস হিসাবে রাখার দরকার নাই। সব সমান হয়ে যাক।

—জাতি এবং শ্রেণী !

—আবার বাঁধা বুলি বলে। আরে বাবা, ও কথাটা তো তপন-বাবুর লেকচারে হরঘড়ি শুনি। কিন্তু সব যদি এক করে দাও, তা হলে ওদের সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে ?

—তা হচ্ছে।

—তা হলে এরা পারবে কেন ? লোধা, বিরহড়, পাহাড়িয়া ? এরা তো আদিবাসীর মধ্যেও পিছনে পড়ে আছে।

—হ্যাঁ, ভারি গোলমেলে সব।

—মাতঙ্গ হঠাৎ খুব সস্নেহে অশোকের পিঠে চাপড় দিল। বলল, বড় গোলমাল লাগে তোর, তাই নয় ? মাথাটা কেমন করে বুঝি রে ?

অশোক মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” জানাল। খুব অভিভূত হয়ে পড়েছে ও। অনেক আগেকার কথা মনে পড়ে। বহুকাল হয়ে গেল ? তা হবে। তার বয়েসই তো বাইশ হল। অশোক তখন বেলবনী আদিবাসী বোর্ডিঙে থেকে স্কুলে পড়ে। মাতঙ্গ তখনও চাকরিতে আছে আর ছেলেকে দেখতে বোর্ডিঙে যেত। একটি ফুটবল খেলার প্যাণ্টের জন্যে অশোক মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। মাতঙ্গ ওর হাতে

একটা প্যান্ট দিয়ে বলেছিল, যা, ম্যাচ খেলা তোর হবে। এই নে প্যান্ট।

এত বছর বাদে আবার মাতঙ্গ ওর পিঠে হাত রেখে কথা বলল। মাতঙ্গ বলল, আমারই গোলমাল লাগে সব।

খুব পচা একটা গন্ধ নাকে এল।

মাতঙ্গ বলল, কাগজকলের গন্ধ।

—বাতাসটা বিষ করে ফেলেছে। এত মশা ছিল না আগে। এত মাছিও ছিল না।

—গাছ কেটে মরুভূমি করে দিল সব। গাছগুলি ছিল দেবতা, জানলি অশোক? মাটি সরস রাখবে, তোমায় ফল-পাতা-কাঠ দিয়ে বাঁচাবে, বাতাস হতে বিষ টানবে। বন থাকতে এমন দুঃখ-উপাস ছিল না। গরিব তো তখনো ছিল। বন রক্ষার, জানোয়ার রক্ষার আইন জানতাম না, এত পাহারাদারী ছিল না কিন্তু বনও ছিল জানোয়ার পাখিও অঢেল।

—স্বাধীনতার পর তো পালটাবেই।

—হ্যাঁ, তাই।

—কি দুর্গন্ধ।

—দুর্গন্ধটা বিষ ছড়ায়, না কি বল?

—হ্যাঁ, ছড়ায় তো। কি ভাবে? হ্যাঁ, গাছ কাটা পড়ছে। কিন্তু নতুন গাছ তো লাগাব আবার।

মাতঙ্গ কিছুক্ষণ জবাব দেয় না। তারপর বলে, কি বললি? গাছ? শাল কাটছে, শালের জায়গা মানুষের মনে গাঁথা থাকল। সে জায়গা ওই বিলুবাবুর চুলকাটা হালফেশানী বউয়ের মতো দেখতে ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণি নিতে পারবে না।

—তুমিও প্রভঞ্জনদাদার মত কথা বল।

—না। মনের কথা বলি।

—তুমিও সময়ের গতিকে মানবে না?

—হ্যাঁ, সময়ের গতি, এখন এটা দরকার। এই তো? তা ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণি হতে সরকারের লাভ, মানুষের কি? কিছু শালবন ফেলে রাখলে অঞ্চলের মানুষের মন পাওয়া যেত। শাল সর্বরকমে বাঁচায় বলে না সে গ্রামদেবতা হয়?

—দেবদেবতা নিয়ে আমরা কি করব?

—তাই বুঝি গড়ামদেবতা মানিস না, হ্যাঁ অশোক?—মাতঙ্গ মাথা নাড়ে, আস্তে বলে, আমি স—ব মানি। কেন মানব না? আমার দেবদেবতা তোরে দিতে পারি, তার বদলে তুই আমায় কি দিবি? কিচ্ছু নাই তোর। আমি এই বয়সে সব খোয়াতে পারব না।

দু'জনে চুপ করে যায়। বাতাসে দুর্গন্ধ। মাতঙ্গ বলে. ডান-ডাইন হুজুকটা এমনি বিষ ছড়ায়।

—এখনো সেই কথাই ভাবছ?

—ভাবব না? হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে তবে মানুষ এই ধুয়া তোলে।

—দরকারে?

—কাল আসিস। বলব।

॥ ৩ ॥

টাউনে "মোর লাইট অথবা আরো আলো" সংস্থার অফিসটি একটি মস্ত বাড়ির একতলায়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অশান্ত অঞ্চল-গুলিতে "আরো আলো" সংস্থার কয়েকটি অফিস আছে। এরা গ্রামে গ্রামে অনেক দরকারী গবেষণায় নিযুক্ত। যেমন—পাহাড়িয়া আদি-বাসীরা যথেষ্ট স্নান করে না কেন।

সাধারণ গোলা লোকের মনে হবে, "জল পায় না বলে।" সংস্থাটি এই সহজ কথাটি খুঁজে বের করার জন্য মাথাপিছু মাসে হাজার টাকা

ও অন্যান্য খরচা দিয়ে অজস্র ভারতীয় গবেষক ছেলেমেয়েকে গ্রামে গ্রামে ছেড়ে রেখেছে।

এই সংস্থার সব খরচাই বিদেশ থেকে আসে। সে সব দেশের নিজস্ব সমস্যাগুলির সমাধান নিশ্চয় শেষ হয়েছে। ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত জংলী পাহাড়ী জায়গায় সমস্যার সমাধানে এ সব দেশ অত্যন্ত তৎপর।

টাউনে "আদিবাসী বন্ধু" সংস্থাটি সবে ঢুকেছে। যে সব জায়গায় "আরো আলো" সংস্থা পৌঁছতে পারছে না, সেখানে "আদিবাসী বন্ধু" হাজির হচ্ছে। এদের গবেষণার বিষয় "আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস"।

এ ছাড়া "গোঁসাই সমাজ", "গরিবের জন্য রুটি", "গরিব জাতি ঐক্য সমিতি" এ সব সংস্থাও আছে। এই তিনটি সংস্থা হাতেকলমে উন্নয়নের কাজ করে থাকে।

"আরো আলো" সংস্থায় সম্প্রতি স্থানীয় লেখক বিনয় ঢুকেছে। অশোক সকালে মাতঙ্গের বাড়ি গিয়ে দেখে, বিনয় বসে আছে, সঙ্গে দীপক। দীপক রাজাবাবুর কাকা বিশ্বনাথের ছোট ছেলে। দীপকের দুই দাদা ক্ষীরোদ ও চরণ কাজ করছে। দীপক এবং তার দুই বোন মাধবী ও শেফালী এখনো ছাত্র। দীপক অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল হাসি-খুশি ছেলে। ওরা তিন ভাইবোন ভালো গান করে। টাউনের বাইরে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও গিয়েছে। দীপক অশোককে দূর থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

বিনয়ের সঙ্গে দীপককে দেখে অশোক একটু অবাক হল। "আরো আলো" বা "গোঁসাই সমিতি" বা অনুরূপ সংস্থাগুলি যে জালি এবং দু' নম্বরী, এহেন কথা দীপক হরদম বলে থাকে। "আদিবাসী বন্ধু" আপিসের গায়ে "আদিবাসী শত্রু" লিখেছিল যারা, দীপক তাদের মধ্যে ছিল।

মাতঙ্গ বলল, শুনেছ কাণ্ড?

—কি?

—বাবা! সেদিনই আমি বলিনি, যে ঘোঁট পাকছে? যাকগে, বিনয় কি বলছে শোনো।

বিনয়ের মুখে একটা আলগা, মেকি হাসি সর্বদা লেগে থাকে। সেই বিনয়ও গুম হয়ে বসে আছে। দীপকের চোখমুখ রীতিমত বিব্রত।

—কি হল বিনয় দাদা?

—থাক গে। তুমি আবার তো আমার সব কিছুতেই চক্রান্ত আর অভিসন্ধি দেখ।

—বলুন না।

মাতঙ্গ বলল, আমি বলছি। দীপকের বউদি, চরণের স্ত্রী নাকি সন্তান হবার পর থেকে অসুস্থ। দীপক বলছে ওর মা জেনেছেন এ ডান-ডাইনেব কাজ। কে ডান-ডাইন, তা নাকি মাধবী আর শেফালী বলে দেবে। আর বিনয় বলছে, এই নিয়ে তারা রিসার্চ করবে। আমি যদি সাহায্য করি, তা হলে আমাকে অনেক টাকা দেবে।

বিনয় বলল, তা বলিনি। আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। তাই সে অভিজ্ঞতার দাম দিতে চেয়েছি। আপনি তো জানেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন।

—দাম দেবে কি হে? মাতঙ্গ সরকারে এত কাল যেমন হোক চাকরি করেছে, এখন সে পেনসন খায়। ধান জমিও কষ্টেসৃষ্টে পাঁচ কুড়া করেছি। গ্রামের বাড়িতে ছেলে চাকরি পেতে ঘরে টিন দিয়েছি। সাধ্যমত মানুষের ভাল করতে চেষ্টা করি। তেমন সাধ্য নাই, পারি না। ডান-ডাইনি আমি দেখি নাই কখনো।

দীপক বলল, বাড়িতে বলছে।

—কি করেছে ডাইন? তোমার বউদিকে মেরে ফেলেছে? না আর কিছু করেছে?

দীপক গজগজ করে বলল, নাঃ। বউদির দাদা এসে তাকে নিয়ে গেছেন কলকাতা।

—কেমন আছে?

, —ভাল আছে।

—হল রোগ, সারাচ্ছে ডাক্তার, আর তোমরা ডাইন খুঁজছ? না না, এ ভালো কথা নয়।

সংশয়ভরা চোখে দীপক কি বলতে গিয়ে বলল না। হ্যাঁ ডাইন দেখেছি। কেমন জান? পাতরকুড়া গ্রামে মতি লোহারনি না কি ডাইন। কেন সে ডাইন? কেননা গরুর মড়ক লেগে ঘরে ঘরে গরু মরছে। সে বাহানা কত! দেওরা ডাইন সাব্যস্ত করেছে, ডাইনের জান নিবে সকলে, তখন চাকরিতে আছি। মতিকে সরালাম। সরকারী ভেট ডাক্তার আনি, ইঞ্জেকশান দেওয়াই, গোমড়ক বন্ধ হল।

এই!—বিনয় নিরুৎসাহ হল।

—এই দেখেছি। যেখানে ডাক্তার নাই, হাসপাতাল নাই, অসুখে মরে, সেখানে ডাইন! একটা বা দুটো লোক ডাইনের কথা তুলে প্রচার দেয়। গাঁয়ের অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষ ডাইন মারে। এ কি শুনছি? সমাজে যাদের তুল্য শিক্ষিত আর ধনী নাই, তারা ডাইন দেখছে? শুনলেও বিশ্বাস হয় না যে।

বিনয় বলল, বলাইদা বলে, ডাইন আছে।

—নাই। বলাই খুব মিশেকুশে সবার সঙ্গে আমাদের ভাষাও বলে। তাতে তারে বলাই সন্তালও বলা হয়। কিন্তু সে কি জানবে? মদ খায় বলে দীপকদের মাহিন্দার প্রহ্লাদ বড় মন্দ। বলাইয়ের তো সন্ধেবেলা বিলাতি চাই। পয়সা বা দেয় কে? অমন লোকের কথায় বিশ্বাস কি? আর বিনয়। এখানে ডাইন আছে না নাই, তাতে তোমার বিলাতি মনিবদের এত মাথাব্যথা কেন?

—এর একটা জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক আছে না?

—ডাইনির আবার জ্ঞানবিজ্ঞান কি বাপু? তোমার মত লোকদের হাতে প্রচার হয় যে আমরা জংলী, ডান-ডাইনে বিশ্বাসী। সমাজটা যে পাঁচজনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চাইছে তা তো তোমরা লেখ না? যাও যাও, ও সব অন্তত্তর কর গা।

অশোক বলে, দীপক। এ কি?

—আমি কি করব?

—বলবে, বুঝাবে যে এ সব হয় না।

বিনয় ও দীপক চলে যায়। পরম ক্রোধে মাতঙ্গ একটা বিড়ি ধরায়। কয়েকটা টান দেয়। তারপর বলে, কখনো ভুলেও বলবে না যে সেদিন প্রহ্লাদ কি বলেছিল। এর মধ্যে কথা আছে কোনো।

—বলাইবাবুর নাম বলে গেল।

—সে লোক দিনে মানে আমাদের বন্ধু, রাত হলে রাজাবাবুর কাছে দৌড়ায়।

—বরাবরই এক রাজনীতির লোক।

—সেই জন্যে সে মন্দ?

—মন্দ রাজনীতির একটা প্রভাব থাকেই।

—ও সব বলে লাভ নেই বাপু। মন্দ লোক তোমার রাজনীতিতেও আছে। সবাই কিছু অটলবাবু নয়।

—কি করবে?

—দেখি সোমরাইকে শুধাই।

শহরেই সোমরাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সঙ্গে বিবাহিতা বোন রজনী। রজনীর ছেলের জন্যে ওরা ওষুধ নিতে এসেছে। ছেলের মা হয়েও রজনীর চপলতা যায় নি।

—ছেলের অসুখ, মায়ের কাছে এসেছি দাদা।—কথাটা সে প্রায় নেচে নেচে বলে।

—তুই যেন খল্লিহাট থাকিসই না। সর্বদাই তো এখানে দেখি।

রজনীর হাসিমুখ আরো ঝলমল করে ওঠে। সে বলে, দাদার বউ হয়নি এখনো। না হওয়া ইস্তক আসব যাব, তোমার বোনাইকে বলে রেখেছি। মা বুড়ো হচ্ছে, তায় কানে শোনে না, একা পারে।

সোমরাই বলল, না পারে তো সে আমরা বুঝব। যেমন আসতে লেগেছিস, দেবে তাড়িয়ে।

—আমাকে ? ঈশ্‌।

অশোক বলল, তা ওষুধ কিনে ঘরে যা। সোমরাইয়ের সঙ্গে কথা আছে।

—না, অতখানি পথ একা যাব না এখন। কথা বল তোমরা, আমি বাজার করি।

—কি কিনবি ?

—আলু, আর লঙ্কা। দাদা মাছ এনেছে।

রজনী চলে গেল। মাতঙ্গ বলল সব কথা। সোমরাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, রাজাবাবু এখন ঘন ঘন যাচ্ছে। কি যেন একটা চলছে বলে মনে হয়। ওদের চৌহদ্দিতে তো সরকারী কুয়ো। জল আনতে যায় মা, কখনো আমিও যাই। আমাদের দেখলেই ফটফট করে জানলা বন্ধ করে দেয়।

—বুঝলাম।

—আমরা দেখ সাতে পাঁচে থাকি না। ভূতগত খাটব সারাদিন। ফাঁকে ফোকরে মাঠের কাজ আছে। একটা জিনিস দেখছি। বিশ্বনাথবাবু, নয় তারানাথবাবু, যারে পথে দেখলে 'নমস্কার বাবু" বলব, সেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

—গ্রামটি তো বাপু রাজাবাবুর কলোনি। সবাই তার দখলে। সাবধানে থাকবি। প্রহ্লাদ আর মুনশিরাম, ওদের এড়িয়ে চলবি।

—কেন ?

—কোনো বিপদ হতে পারে।

—আমাদের সঙ্গে ? রাজাবাবুর ? তিনি তো রাজা মানুষ। আমরা পিঁপড়াও নই তার কাছে। আমাদের কি বিপদ হবে বল না ? জমিটার জন্যে ?

—জমিটা তোর প্রাণ, তাই না রে ?

—সে যে কি প্রাণ, তা কি বলি দাদা। কাজে আসব যাব, জমির দিকে চেয়ে দেখব।

—তাই তো হয়। মোটে পাস নি আগে।

—না। তাতেই তারানাথবাবু রাগ রাগ হয়ে আছে। মুনশিরাম পেল না। বলে, এ সরকার তেলা মাথে তেল ঢালে, গরিবকে দেখে না।

—হ্যাঁ। ঠিক বলেছে। তা রাজাবাবুর লোকজন হয়ে গ্রামের গরিব আগে পায়নি কেন?

—কে বলবে। আচ্ছা দাদা! এখনো তো খাস জমি বিস্তর আছে। কারা পাবে?

—কে জানে? তখন তো সবাই দরখাস্ত দিলে এক হিড়িকে আর কারো হত হয়তো। কে পাবে কে জানে। কেন? আছে না কি কেউ?

—আছে তো অনেকেই। আমাকে দেখে এখন খানিক সাহসও হয়েছে। বলছে লুকিয়ে এসে। তবে পঞ্চায়েত হয়ে তো আসতে হবে। তাতেই গণ্ডগোল।

—দেখা যাক। আমরা তো আছি।

—সবাই বলছে, পার্টির লোক নইলে জমি দেবে না। অশোক ছিল বলে তুই পেয়েছিস।

অশোক চুপ করে থাকল। তারপর বলল, নিয়ম যখন আছে যে ভূমিহীন জমি পাবে, তখন দরখাস্ত করুক। তারপর দেখা যাবে।

মাতঙ্গ মাথা নাড়ল। বলল, এক ছিটা জমি! তাতে অভাবও যাবে না। সব রাজাবাবুর পরিবারে চলে যাবে। ধারকর্জ করবে তো!

সোমরাই বলল, ডাইনি নাই। আমি তো শুনিনি কিছু। কথা হলে জানতাম।

সোমরাই একথা বলে চলে যায়। কিন্তু রাজাপুরের রাজবাড়িতে কান পাতলে শোনা যায় "ডাইনি! ডাইনি!" চরণ অত্যন্ত অপরাধীর মতো মুখ করে থাকে। ডাইনির তুকতাকে তার বউ অসুস্থ, এই সিদ্ধান্ত প্রথমে নেন রাইমণি এবং প্রসঙ্গটি টেনে নিয়ে চলেন রাজা-

বাবু। এভাবে সমগ্র ব্যাপারটি কোনো পরিণামের দিকে যাচ্ছিল। মাঝ থেকে তার শ্যালক এসে ডাইনির ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বোনকে সারাতে নিয়ে গেছে। চরণের বউ ক্রমে ভালো হয়ে উঠছে। এটা ঠিক কাজ হল না।

রাজাবাবু বলেন, তুমি চিন্তা করো কেন? ডাইনি আছে, গ্রামেই আছে।

—বুঝব কি করে?

—এ কি চাপা থাকবে?

চাপা থাকে না। রাজবাড়ির লোকগুলি ডাইনির আতঙ্কে থমথমে হয়ে থাকে। ডাইনির ব্যাপারটি যে তাদের তৈরি করা তাও যেন তারা ভুলে যায়।

এরই মধ্যে মুনশিরাম এসে বলে, আমার দরখাস্তটা এবার দেব বাবু।

—কিসের দরখাস্ত?

—জমির।

—বটে! তোরা কে কে আছিস?

মুনশিরাম সতেরো জনের নাম বলে যায়। এই গ্রামের গোকুল, কপী, মতিরাম, ক্যাতা, বেলুনচাঁদ, এ রকম সতেরো জন লোক জমি চায়। রাজাবাবুর অত্যন্ত বিপন্ন বোধ হয়। এরা যে সকলে তাঁর জমিতে খাটে তা নয়। যারা তাঁর জমিতে খাটে, তারা খেটে চলবে তাও তিনি জানেন। কেননা যেটুকু জমি পাওয়া যাবে, তাতে ভাত উঠবে না। তাই, বিপন্ন বোধ করার কোনো কারণ তাঁর নেই। এবং দরখাস্ত দেয়া ও জমি পাওয়া, দুয়ের মাঝে তফাত অনেক, তাও তিনি জানেন।

তবু তাঁর মনে হয় তিনি ভীষণ বিপন্ন। ভূমিহীনরা ভূমি চাইছে? যেন সবাই জমি পেয়ে গেল। যেন তাঁকে হাতে ধরে লাঙল চষতে হবে।

এখনি ডাইনি নির্ণয় করা দরকার। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত লোকগুলিকে ভয় দেখানো দরকার।

এই সতেরোটি লোকের নাম এবং "ডাইনি" শব্দটি রাজবাড়ির ঘরে ঘরে গুঞ্জিত হতে থাকে। মাধবী ও শেফালি দীপকের দুই বোন জ্বরের ঘোরে শুয়ে শুয়ে নামগুলি শোনে। ভীষণ জ্বর চলছে এখন ঘরে ঘরে। খুব জ্বর সাত আট দিন, তার পর ঘাম বেরোচ্ছে। সবই উল্টে গেছে, অসুখের নিয়মও।

মাধবী নাকি অসুখের ঘোরে চেঁচিয়ে বলে, রাজাদাদা ঠিক বলেছেন গো !

—কি বলছিস ?

—ডাইন করেছে আমাদের।

—কে করেছে ?

—লখিন্দর, তার বউ গোপালী, মণি, ক্যাতা, ক্ষেমদাস, বেলুনচাঁদ —লিখে দিচ্ছি।

মাধবী লাল চোখে উঠে বসে ও খাতা টেনে নাম লিখতে থাকে। শেফালি এ সব শুনে বিছানায় দাপা-দাপি করতে থাকে।

এ সব ঘটনার সাক্ষী কেউ থাকে না। কিন্তু সকালে রাজাবাবুর ডাকে গ্রামের সবাই এসে জড়ো হয়। রাজাবাবু বেশ গম্ভীর, থমথমে গলায় বলেন, শোনো হে গ্রামের পাঁচজন।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

—এই গ্রামে ডাইনি করছে কেউ কেউ। কাল মাধবী আর শেফালি, অবিবাহিত মেয়ে তারাও—অসুখের ঘোরে স্পষ্ট জেনেছে কে কে ডাইনি।

—ডাইনি ? রাজাপুরে ?

—হ্যাঁ, ডাইনি। শোনো—

নামগুলি বেশ হেঁকে পড়া হয়।

—তোমরা নিজেরা যে যার কাজে যাও। ডান-ডাইন নিয়ে বসবাস করতে আমি দেব না, তোমরাও দিবে না, তা আমি জানি। আজ রাতে সভা হবে।

সোমরাই চেঁচিয়ে ওঠে,—এ একটা ফন্দী বটে। যারা জমিন চেয়ে দরখাস্ত দিল. তার ভিতরে বাড়ির মান্দার চার জনার নাম বার করে নিলে আর আমাদের মা বেটার, লখিন্দ আর তার বউয়ের নাম ঢুকাস্সে—তাতে কি বুঝব, আপনারা যাদের উপর গরম হয়েছ তারাই ডাইন? কে ডাইন? কিসে ডাইন?

এ কথায় খুব একটা কথাবার্তা শুরু হয়। লখিন্দর বলে, অনেক দিন শাসানি শুনছি যে টাকা নে. জমির খিঁচটা সেরে নিই। মেয়েটাকে কোলগত করে নিয়েছি থেকে বিষ হয়েছি আপনাদের চোখের। আজ ডাইন হলাম। হা রে কপাল।

এখন রাজাবাবুর পাশে একে একে তাঁর কাকা আর ভাইরা এসে দাঁড়ায়। জনতার বুকে কাঁপুনি শুরু হয়। তারা তো জানে যে কংগ্রেস বা বাম ফ্রন্ট কথার কথা মাত্র। তারা এই রাজাবাবুর পরিবারের প্রজা মাত্র। কখনো, দিল্লী কখনো কলকাতা, কখনো থানা দেখিয়ে রাজাবাবু তাদের পায়ে দলে রেখেছে। এ পরিবারের লোকদের "প্রণাম হই বাবু" বলতে এক সকালে ভুল হলে সাঁঝে কেরোসিন মেলা কঠিন।

রাজাবাবু হাত তোলেন ও বলেন. আজ রাতে সভা হবে। আর এ কথা গ্রামের বাইরে যেন না যায়।

সারা দিন গ্রামটি থমথম করে। লোকগুলি মুখ কালো করে যে যার কাজে যায়। সোমরাই রজনীকে বলে, তুই ফিরে যা ঘরে।

—কেন? যাব কেন?

—দিগম্বর রাজাবাবুর অনুগত হয়। কি শুনতে কি শুনবে আর তোর সঙ্গে অশান্তি হবে।

—কিসের অশান্তি?

—রাজাবাবু ডাইনির কথা তুলে কিবা ঝামেলা করতে লাগল। এর জন্য অনেক কেচাকেচি তো চলবে।

—তোদের মায়া করবে, দাদা?

—আমি জানি?

—যাব না এখন। দেখাই যাক।

—সোমরাই রেগে বলল, বুদ্ধি নাই তোর।—রেগেই সে কাজে চলে গেল। রজনী গেল ভাত রাঁধতে। রাজাপুরে দুটি সরকারী কুয়া। চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ তাতে উবুচুবু জল। সে কি মিষ্টি জল! মনে হয় মিছরির পানা খাচ্ছি। শরীর নিমেষে জুড়ায়।

মণি জল নেয়, জল তোলে, কে তার নাম ধরে ডাকল। মণি চমকে তাকাল। তারপর ভরা কলসি মাথায় ধরে ভয়ে চোখ বুজে রইল। রাজাবাবু গো! মায়া কর না আমাকে। অশোক ছিল বলে জমি পেলাম, বড় দোষ করেছি বলে জানি না গো। তোমাকে দেখে আমার বুকে ঢিপঢিপাচ্ছে বিস্তর।

—মণি।

—রা-জা-বা-বু!

—আজ সভা হবে।

—রা-জা-বা-বু।

—তখন তোকে কাজ করতে হবে।

—কি কাজ?

—তুই পুজাপালা করিস, তোর মনে ধর্মে মতি। সে সভায় তুই বলবি, লখিন্দর আর গোপালী ডান-ডাইনি। ওরা ডাইন করেছে এ কথা বলতে পারিস যদি—তা হলে তোর কোনো ভয় নেই।

নিরন্ন নিভুঁই লোক, নিজের মতো ঠাকুরঠুকুর পুজো করলে, সে কারণে বছরের পর বছর মানুষের কাছে ভক্তি পেলে সম্ভবত সে আকাট উজবক হয়, নইলে দুরন্ত সাহসী নির্বোধও পরিণাম না বুঝে এক ধরনের দুঃসাহস দেখাতে পারে। অথবা ধর্মবিশ্বাসী।

মণির মাথায় কি কাজ করল, কোন চিন্তা, বলা যায় না। তারপর তার মনে হল যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজাবাবু। এই লোকের টাউনে তিন লক্ষ টাকার বাড়ি, গ্রামে অসাগর জমি, নির্বাচনে বিরোধিতা করতে গিয়ে এ লোক গাঁটের কড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

এর যখন ক্ষমতা ছিল, গ্রাম-জ্ঞাতি মণিকে এ এক ছটাক জমি পাইয়ে দেয়নি, সোমরাইকে কাজ দেয়নি। না, লোকটা ভালো নয়, গরিবের দুশমন এ চিরকাল। মণি কলসি শুদ্ধ মাথা নাড়ল।

—রাজাবাবু। লখিন্দর আর গোপালী আমায় কোনো ক্ষতি করে না, তাদেরকে ডাইন বললে আমি ধর্মে পতিত হই, এ আমি পারব না।

—দেখা যাবে।

—পারব না। ডাইন কেউ করে না, কারো সময় নাই। নুন আনতে পান্তা ফুরায় গো রাজাবাবু, আমরা জানি না ডাইনের বৃত্তান্ত।

আজ রাতের সভায় খুব কম লোক থাকে। উঠানে হাজাক জ্বলে ও চেয়ারে বসে বিশ্বনাথবাবু বলে, মণি লখিন্দর আর গোপালী ডাইন।

এ ভাবেই সভা চলতে থাকে। প্রতি সভায় রাজাবাবু কালো পাথরের হিংস্র প্রেতের মূর্তির মত নিশ্চল বসে থাকে ও মাঝে মাঝে কথা বলে। এ ভাবেই জমে ওঠে প্রেতোৎসব। টাউনে কেউ জানতে পারে না। কোনো সভাতেই সকলে থাকে না। আজ দশজন, কাল অন্য পাঁচজন, এ ভাবে সভায় লোক থাকে। লোকগুলি জেনে যায় যে ডাইন নেই। ডান-ডাইনি রাজবাড়ির কাছে এখন দরকার। কেননা মণি ও সোমরাই, লখিন্দর ও গোপালী, এদের উপর রাজাবাবুর রোষ পড়েছে।

তারা এ কথাও বোঝে যে ওই চার জন লোককে ডাইন সাব্যস্ত

না করলে রাজাবাবু ছাড়বে না। কোথায় যেন একটা ভীষণ জেদের প্রশ্ন এসে পড়েছে। তাদের মনের অতলে অন্ধকার সব যুক্তি কাজ করে। রাজাবাবুর সঙ্গে পারবে কে? এ লোক সত্যি দিল্লী কলকাতা হাতে রাখতো সেদিনও। এক আদিবাসী জাতির লোক? না, রাজাবাবুর সমাজ অন্ত্যদের নিয়ে। রাজাবাবু চায় যখন, তখন চারজন ডাইন-ডাইনি হোক না কেন? ওদের উপর রাজাবাবুর রোষ পড়েছে যখন, তখন তো ওরা এমনিতেও মরেছে, অমনিতেও মরেছে।

পরে সব যখন জানাজানি হয়, তখন অশোক বলেছিল, কেন, কেন, কেন? কেন গ্রামের মানুষগুলি এমন করল? কেন, কেন, কেন?

উত্তরটা ও বছর দুয়েক বাদে এক সরকারী গ্রামীণ দারিদ্র্য সমীক্ষা থেকে পেয়েছিল।

তাতে লেখা ছিল :—

"১৯৭৮ সালের সপ্তম ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ দারিদ্র্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান, ভারতবর্ষে, দ্বিতীয়। ১৯৭১ সালে দেখা গিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসী গরিবরা মাসে মাথাপিছু ১৫ টাকা খরচ করতে অসমর্থ। পশ্চিমবঙ্গে নগরদারিদ্র্য আর গ্রামদারিদ্র্যে আকাশপাতাল তফাত। ভারতের আর কোনো রাজ্যে বুঝি গ্রামের দারিদ্র্য শহরের দারিদ্র্যের তুলনায় এত বেশি নয়।

"...এই ভারতে, খাওয়ার পিছনে কে কি খরচ করে সে হিসাবে ১৯৭৩-৭৪ সালে শতকরা ৭৫ জন গরিব, একেবারে গরিব শতকরা ৬৭ জন আর ভীষণ রকম গরিব শতকরা ৫৯ জন।"

হিসেবটা ১৯৮১ সালে অশোকের হাতে আসে। পাতলা বইটা পড়তে পড়তে অশোক অনেকগুলো "কেন"র উত্তর পেয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে রাজাপুর গ্রামের গরিব লোকেরা ডান-ডাইনির ব্যাপারে নেই জেনেও রাজাবাবুর ইচ্ছেমতো কাজ করেছিল। কেন করেছিল? কেননা তারা সবাই ওই শতকরা পঁচাত্তর জনের মধ্যে পড়ে।

কয়েকজন পড়ে সাতষট্টি জনের মধ্যে আর নিভুঁই মজুররা পড়ে উনষাট জনের মধ্যে।

ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য আর সে জন্য রাজাবাবুদের ভয় করে চলা অভ্যাস হয়ে গেছে। সেজন্যেই তাঁরা রাজাবাবুর ইচ্ছেমত কাজ করেছিল। সেজন্যেই।

॥ ৪ ॥

রাজাপুরের গ্রামবাসীরা রাজাবাবুর এই প্রেতোৎসবে ক্রমে ক্রমে এসে শামিল হয়। কিছুতে মুখ খোলে না তারা। আর চৈত্র মাসের শেষ হয় হয়, এমন দিনে ঢোলডগর দিয়ে রাজাবাবুর বাড়িতে গ্রামের সবাইকে ডাকা হয়।

—ডান-ডাইনের হদিস আজই করে দিব—অবসরপ্রাপ্ত এক সরকারী কর্মচারী বিশ্বনাথ ঘোষণা করেন।

—আমি করব হদিস!—বলে গ্রামের এক দরিদ্রতম বৃদ্ধ খোদন উঠে দাঁড়ায়। আকাশপানে দু হাত তুলে সে দেবদেবীদের ডাকে। তারপর বসে পড়ে সে, দুলতে আরম্ভ করে।

—ঝুপার হয়েছে খোদনের, ভর হয়েছে, এবার ও বলবে হে কে ডাইন!

রাজাবাবু সোল্লাসে চেঁচান। খোদন দুলতে দুলতে হঠাৎ উঠে পড়ে ও ছুটে যায়; সে মিলায় আঁধারে। নিমেষে শোনা যায় নারী কণ্ঠে আর্তনাদ, না! না! না!

খোদন একই ভাবে ছুটে আসে আবার। তার পিছন পিছন আসে মণি। রজনী আসে ছেলে কোলে। খোদন আছড়ে আছড়ে মণির পূজিত ঠাকুর মূর্তিগুলি ভাঙতে থাকে। মণি মুখে কাপড় গুঁজে থরথর করে কাঁপে তারপর আর্তস্বরে বলে, জমি তুমি নিয়ে নাও গো

রাজাবাবু। ঠাকুর ভেঙো না। গোকুল কি দেখ। কি দেখিস উদ্ধব তোরা? ঠাকুর ভেঙে দিল খোদন!

খোদন সবগুলি ঠাকুর ভেঙে, ডাইনি! ডাইনি! বলে মণিকে মারতে থাকে। সোমরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ও খোদনকে টেনে আনে। তারপর দুরন্ত ক্রোধে ও অপমানে বলে, তোর বুপার হয়েছে, বুপার? দেখ্ শালা কে তোকে বাঁচায়।

খোদন চেঁচায়, রাজাবাবু গো!

গোকুল, বেলুনচাঁদ ও উদ্ধব বলে, যা হয়েছে, খুব হয়েছে। সমাজ ডেকে মণিকে মারাধরা, এর জবাব কে দিবে? এ কি কাজ?

বিলাতী দাসী বলে, এমন সমাজে কাজ নাই, এমন বুপার দেখি নাই।

রাজাবাবু বলেন, এবার দেখলি।

—কেন এত ডান-ডাইনের কথা সব আমরা বুঝে গেছি গো! এ কি কাণ্ড?

মণি কাঁদতে থাকে। রজনী, মণির মেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে ও বলে, এক ছিটা জমির লালচ আমার বুড়ী মাকে ডাইনি বানাল রাজাবাবু?

কথাটি অতীব ভয়ঙ্কর। রাজাবাবু বলেন, তোর মা ডাইনি নয়?

ক্ষিপ্ত সোমরাই বলে, যে আমার মাকে ডাইনি বলে, তার মা ডাইনি! চল্ মা।

শোন সোমরাই। সমাজ ডেকেছি আমি। তোর মা যদি গ্রামে থাকতে চায় তবে হাজার টাকা জরিমানা দেবে। হ্যাঁ, হাজার টাকা জরিমানা ডাক হল।

—হাজার পয়সা দিব না।

—দিবি না?

—না।

—সমাজ তোকে জরিমানা করে।

সোমরাইয়ের কথা ডুবিয়ে রাজাবাবু প্রচণ্ড চীৎকার করেন। বলেন, আমরা আদিবাসী হই, সমাজ মানি।

সোমরাই বয়সে যুবক, আর ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে এখন তার রক্ত জ্বলে খাক হয়ে গেছে। সে আরো জোরে যেন হাহাকারে বলে, তুমি আমি জাতে এক, আর কিসে এক হই? তোমাকে, তোমার জ্ঞাতবর্গকে সেলাম দিতে দিতে আমরা ভুলে গেছি যে তোমাদের দীপক আর আমি এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম। তাকেও "পরণাম হই" বলি। হাজা-র টাকা! হাজার টাকা তোমার ঘরে খোলামকুচি, আমার মায়ের কান সারাতে কলকাতা নিব তা তিনশো টাকা যোগাড় হয় না। সমাজ রাজাবাবু? এটা সমাজের বিচার হয় না। এটা তোমার বিচার। তুমি সমাজ, তুমি সরকার, তুমি সব? চল্ মা, রজনী চল্।

সোমরাইয়ের গলার স্বরে হাহাকার থাকে। বঞ্চিত, শোষিত, হতভাগ্য মানুষের হাহাকার। ওরা চলে যায়।

বৃদ্ধ ভরত আর প্রৌঢ়া পার্বণী এ-ওর দিকে চায়। পার্বণী মণির মাসতুতো বোন। রজনীকে সে মানুষ করেছিল। একমাত্র লক্ষ্মী নিশিন্দা গ্রামে থাকে, শ্বশুরবাড়ি। মা! রাজাপুরেও খাটবি খাবি, আমার কাছেও খাটবি খাবি। তবে কেন চলে আয় না?—এমন কথা লক্ষ্মী প্রায় বলে। পার্বণী যায় না মণি, সোমরাই আর রজনীর মমতায়।

পার্বণী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এখন ভরত হাত তোলে। সে নিঃস্ব, ভূমিহীন এক দিনমজুর মাত্র। কিন্তু এখন তার শরীরের রক্তে যেন কিসের ডাক। ভুলে যাওয়া, পিছনে ফেলে আসা কোনো জীবন থেকে যেন মৃত পূর্বপুরুষরা মাদল ও ধম্‌সা বাজায় আর ডাকে।

তারা যেন মনে করিয়ে দেয় যে আদিবাসী সমাজ বৈঠকে সবাই কথা বলতে সমান অধিকারী। হায়! তাদের সময়ে তো একজন রাজাবাবু আর অন্য সকলে ভরত ছিল না। ভরত তবু তাদের নির্দেশ শোনে। সে হাত তোলে।

রাজাপুরের লোকগুলি হাঁ হয়ে যায়। সমাজে সকলের সমান অধিকার, এ তো কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজাবাবু অথবা তার পরিবারের কেউ কথা বললে তার পরে হাত তুলল ভরত? কেন?

—আমি কথা বলব।

—কি?

—গ্রামের সকলকে বলছি, সমাজের সকলকে বলছি। রাজাবাবু অন্যায় করল। মণির হাজার টাকা জরিমানা, মণি ডাইনি, এ অন্যায়। তোমরা বল যে এ হুকুম আমরা মানি না। বল বল!

ভরত যেন তাদের সেই প্রাচীনা দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারা চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, ভরত! তুই আমাদের ক্ষমা কর। পুরানো সমাজ? কি আছে তার বল? রাজাবাবু যা বলে তাই মেনে নিই। কি করব বল? আজ আমাদের মধ্যে বাবা তিলকা মাঝি নাই, সিদো-কান্হু নাই, বুকে সাহস দেয় কে? আমাদের পাশে কে আছে? এই রাজাবাবু জাতিতে স্বজাতি হয়, দরকারে গ্রামসমাজ ডাকে, কিন্তু তার থাকা খাওয়া, চলাফেরা, টাকাকড়ি, অত্যাচার-অবিচার, অন্য মানুষদের মাপে। রাজাবাবুর মতো মানুষদের সমাজ হয় আলাদা। আর সকল ক্ষমতা তো রাজাবাবুদের হাতে। তাতেই আমরা চুপ করে আছি। রাজাবাবুদের সমাজে কালাধলা সমান হয়। আমাদের মতো লোকদের সমাজে কালাধলা সমান হয় না।

ভরত মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে, তারপর সে ককিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, অবিচারে গিরা দিত কারা? এটা কি গিরা দিবার কাজ হল না? নাকি নিজের জাতের অন্যায় করলে গিরা দিতে নাই? আমার বয়স নাই, তোদের ছিল।

ভরত, পার্বণী উঠে চলে যায়।

রাজাবাবু বলে, গোকুল, বেলুনচাঁদ ও উদ্ধব! তোদের জরিমানা তিনশো টাকা করে। অনাদায়ে লাশ ফেলে দিব। কাগজকলের

নালায় লাশ ফেললে কেউ টের পাবে না। দিল্লী, কলকাতা, থানা পুলিশ আমার হাতে, তা মনে রেখে কাজ করিস।

সমাজসভা ভেঙে যায়।

প্রেতোৎসবের শুরু আছে, শেষ নাই। আজ রাতে রাজাবাবুর লোকরা রাজাপুর গ্রামের ঘরে ঘরে হাহাকার তোলে। মুখে কাপড় বেঁধে তারা ভরত, সোমরাই, বিলাতীদাসী, পার্বণী ও উদ্ধবকে ঘর থেকে টেনে এনে মারে। মণির হাত ভেঙে দেয়। ঘরে ঘরে মানুষ প্রেতের প্রতিহিংসার ভয়ে চুপ করে থাকে। এমন দুর্যোগের রাতে রজনী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে যায় ও অন্ধকারে ছুটে গিয়ে ধানক্ষেতে লুকায়। ভোরের আলো ফুটতে সে পাগলিনীর মত টাউনের দিকে ছোটে। নালার দুর্গন্ধ প্রেতের নিশ্বাসের মত তাকে তাড়া করে। মাতঙ্গের বাড়ি পৌঁছে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

মাতঙ্গ আসে। আহত লোকগুলিকে নিয়ে সে থানায় চলে। ডায়েরী লেখায়। তারপর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় থানাবাবু। মাতঙ্গ একবারও জিগেস করে না যে থানায় ডায়েরী করে কিছু হবে কি না। সোমরাই বোবা চোখে চায় তার দিকে।

মাতঙ্গ মুখ ফিরিয়ে থাকে।

আবার সভা হয়। গোকুল, বেলুনচাঁদ, ও উদ্ধব নীরবে তিনশো টাকা দিয়ে দেয়।

মণির পরিবারকে একঘরে করা হয়। গ্রামের কুয়ো থেকে জল নেওয়া তাদের বন্ধ হয়।

সোমরাই বলে, তুই চলে যা রজনী।

রজনী যায় এবং ফিরে আসে। বলে তোমাদের জামাই দিগম্বর আমাকে নেবে না। আমার মা ডাইনি। ডাইনির মেয়ে নিয়ে ঘর করলে রাজাবাবু তাকে তার গ্রামে বিটলাহা করিয়ে ছাড়বে।

এ ভাবেই চলতে থাকে সব। সোমরাই যেন পাথর হয়ে যায়। তার মা ও রজনী জল আনতে যায় করমপুরে। বৈশাখের তাতে জল

বয়ে আনার পর মণি বিড়বিড় করে বলে, দিন কি আসবে না? বিচার কি পাব না? হাঁ রে সোমরাই! তুই তো কয়েক বছর পড়েছিলি স্কুলে। তুই বলতে পারিস না।

সোমরাইয়ের মনে হয়, নিজের মাথাটা পাথর দিয়ে ছেঁচে।

একদিন মণিকে আর একা যেতে হয় না। লখিন্দর আর গোপালী এসে তার সঙ্গে জল আনতে চলে।

—তোরা এলি?

গোপালী জবাব দেয় না। লখিন্দর বলে, আর শুধাও কেন? খোদনের এক ঝুপারে তুমি ডাইনি। আরেক ঝুপারে আমরা ডাইনি। আমরা একঘরে গো।

—তাই বল। একঘরেদের সমাজ বাড়ছে।

—কী হবে?

—দেখি।

এমন সময়ে রাজাপুরে আসে বলাইবাবু।

॥ ৫ ॥

বলাইবাবুর বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। সবাই তাকে আদর করে নাম দিয়েছে "বলাই মুর্মু"। তার চেহারা পাকানো। সারহুল, করম, সোহরাই, পরবপূজার গান গাইতে সে একজন। বলাইবাবু এই শহর ও আশপাশে অত্যন্ত চেনামুখ। সে কোনোদিনই জনগণের উপকারও করে না, অপকারও নয়। বাড়ির অবস্থা তার সচ্ছল। শাসক দলের সঙ্গে তার গভীর মৈত্রীর কথা সে কোনোদিন লুকায় নি।

তার পর জঙ্গলখণ্ড আন্দোলন বেড়ে উঠতে সে ফড়কে উঠল। দিনমানে প্রভঞ্জনের সঙ্গে ঘোরে, সন্ধ্যার পর সে রাজাবাবুর। মণি, সোমরাই, ভরত, এদের সমাজে সে খুব আপনজন। কেননা যে লোক

এমন মদ খায়, এমন নাচে, এমন গান গায়, সে লোককে এরা "তুই বেশ আমুদে বটিস" বলে মেনে নেয়। বলাই খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় তা এরা বুঝেও বোঝে না। তার জন্য অবশ্য এ দেশের আন্দোলনগুলি দায়ী। এ সকল আন্দোলন করে বাবু লোকেরা এবং বাবুলোকেরা কখনো মাটির মানুষদের রাজনীতিকরণ করে না। মাটির মানুষরা মিছিলে যাবে, তীরধনুক নিয়ে জমায়েত হবে এবং আদেশ পালন করবে, এই নীতির উপর এ দেশের গণআন্দোলন চলছে। ফলে এরা শত্রু ও মিত্র তফাত বোঝে না।

বলাইবাবু সাইকেল চেপে এসে পড়ে এবং লখিন্দর ও গোপালীকে বলে, আমি কি নেই? তোরা আমার উপর সব ছেড়ে দে।

সোমরাই বলে, আমাদের জন্যে আর কিছু করতে হবে না তোর। আমাদের কাছে আসবি যাবি যদি, তা হলে রাজাবাবু তোকে বিলাতি মদ খাওয়াবে না।

—না দিক বিলাতি। হাঁড়িয়া খাব।

—যা, ঘর যা।

—রজনীকে দিগম্বর নিবে না?

—জানিস তো সব।

—এ কি কাণ্ড সব? মেয়েটা কোথা যায় বল? তোরা বা কি খাওয়াবি? ছেলেটার বা কি হবে?

রজনীর সঙ্গে এখন মা ও দাদার নিত্য ঝগড়া। অল্প বয়স তার, স্বামী প্রেমে বড় বিশ্বাস ছিল। স্বামীর কাছে একবার যেতে পারলে স্বামী যে তাকে ফিরাবে না, এখনো তার সেই বিশ্বাস আছে। বড় দুঃখ, স্বামী না কি তাকে তাড়াবার পর মনের দুঃখে টাটানগর চলে গেছে কাজের খোঁজে।

খিদে কষ্টে কেচাবেচা রজনী এখন মানুষের কাছে মমতা খোঁজে আর সামনে যাদের পায়, সেই মা দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে।

বলাইয়ের কথায় সে গলে যায়। বলে, ছেলেটাকে নিয়ে খাটব খাব, ব্যবস্থা করতে পার কিছু ?

—দেখিয়ে দেখি।

সোমরাই বলে, লখিন্দর আর গোপালীর ব্যবস্থা করলে, সবার সব ব্যবস্থা হল, এখন আমাদের দেখতে এসেছ।

—তুমি রাজাবাবুর লোক।

—কে বলল ?

—আমার মন বলে।

—এ কথা বলতে পারলি ?

—হাঁ বাবু, তুমি যাও।

—বুঝেছি রে বুঝেছি। কিন্তু বাবু আমি ভাবছি যে রাজাবাবু এমন কাজ করল কেন ? সে তো দয়ার সাগর বললে হয়।

সোমরাই রেগে বেরিয়ে যায়। বলাই মাথা নাড়ে ঘন ঘন। তারপর বলে, রজনী! দাদা আর মায়ের সঙ্গে কি হবে তা বলতে পারি না। তবে দেখ্, আমি থাকি ধর্মপথে। তোরা আমার আপনজন। লখিন্দরের কথাটা আগে শুনি। দেখি কি করা যায়।

লখিন্দর ও গোপালী বলাইবাবুকে বড়ই নিরাশ করে। তারা বলে, মাতঙ্গ বিনা আমাদের কেউ নাই। তাকে নিয়ে থানায় ডায়েরি লিখিয়েছি, কলকাতায় কর্তাদের কাছে চিঠি দিয়েছি।

—মাতঙ্গের কথায় যদি থানায় ডায়েরি করে থাকিস, তবে তো রাজাবাবুর দুশমনি করলি। এ কাজ করতে আছে ? আমি ভাবলাম মাঝে পড়ে সব মিটিয়ে দিব। তা তোরা হতে দিলি না রে।

গোপালী ক্ষেপে উঠে বলে, হাতে কোদাল আছে, মাথা ছেঁচে দিব তোর। দুশমনি সে করল না আমরা করলাম ? জানে মেরে দিবে বলে শাসাতে লেগেছে সে, তা জানিস ? তুই কি মিটাবি মাঝে পড়ে ?

—থানাবাবু তার নামে নালিশ নিল ?

—নিল।

—কাজ দেখাল কিছু? দেখাবে না। সেও তো রাজাবাবুকে ভয় পায়, তাই নয়?

—তাতে কি?

—জানে মারবে বলেছে—

—মরে আছি, মরার ভয় নাই।

মাতঙ্গের সঙ্গে বলাইবাবুর টাউনে দেখা হয়। মাতঙ্গ বলে, রাজাপুরে জল তো অনেক ঘোলা হল। আর ঘোলা করতে যেও না হে তুমি।

—না না, তাই করি?

—মনে রেখো।

—তুমি তো করতে পার কিছু।

—কি করব? আমার ক্ষমতা কি?

—গিরা চালাও না কেন?

—বটে! তা হলে খুব সুবিধা হয় তাই নয়? গিরা চালালাম, তার চলল, লাশ পড়ল আর পুলিশ এসে তছনছ তাণ্ডব জুড়ল, কি বল? ওরা যেমন একঘরে তেমন রইল, আর রাজাবাবু যেমন চালাচ্ছে, তেমন চালাল।

বলাই সরে পড়ে।

মাতঙ্গ হেঁকে বলে, এরাদের "আইনের পথে চলো" ভিন্ন আর কথা বলিনি।

কিন্তু প্রেতোৎসবের নিয়ম, তাতে নররক্ত লাগে। রাজাবাবু এখন সেদিকে ধায়।

সে বলাইকে বলে, রজনীকে ডাকতে পার বলাই?

—কি হবে রাজাবাবু?

—তার মা ডাইনি, দাদা বদমাশ। কিন্তু তার তো দেখ কোনো দোষ নাই।

—হাঁ, আর মেয়েটা কষ্টও পাচ্ছে খুব। এই কাঠটুকায় কাঠ বেচে।

—তাতে কি আর হয়। ছেলে আছে না?

—তা তো আছেই।

—এইটা মনে ভাবি। দোষ করলে শাস্তি দেই। আবার রাজনীটা, তার কষ্ট দেখলে কষ্ট পাই, এ আমার কি স্বভাব বল দেখি? গরিবের দুঃখ, অনাহার কষ্ট, এ আমি সইতে পারি না।

বলাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, কুসুমের মত কোমল যে, বজ্র কঠিন হয় সে।

—হে হে হে, কি যে বল!

—সময়টা মন্দ খুব।

—খু—ব মন্দ।

—কেমন বুঝছেন?

—তুমি কেমন বুঝ আগে বল।

—আমি তো ভাল দেখি না কিছু।

—এ কথায় কিছু বুঝা যায় না।

—আমাদের এ অঞ্চলে ছিল আপনার—আমার রাজনীতিক দলের প্রাধান্য। আজ নাই।

—ভোটের রাজনীতিতে এমন হবেই।

—সব ওলটপালট হয়ে গেল। তাতে জল বেশ ঘোলা হল। এটা একটা মন্দ কাজ হল।

রাজাবাবু দেয়ালের চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেন। নতুন বাড়ির গৃহসজ্জার জন্য তাঁর ভাগ্নে বউ, পিকটোগ্রাফ মেশিনে অনেক রঙিন সুতো খরচ করে অনেক মৃত ও জীবিত নেতাদের প্রতিকৃতি করে দিয়েছে। এই ভাগ্নে বউকে তিনি "ক্ষণজন্মা" বলে থাকেন। রাজাবাবুর মতে "বিলেত হলে নীলিমা নোবেল প্রাইজ পেত।"

এসব ছবি তিন দেয়ালে। এক দিকের দেয়াল জুড়ে রাজাবাবুর এক দৈত্যসদৃশ বিশাল মুখ। এই ছবিটির দিকে তাকালে রাজাবাবু প্রেরণা পান। মানুষ রাজাবাবুকে ছবির রাজাবাবু সান্ত্বনা দিয়ে যেন

বলেন, "ভয় পেও না, ভেঙে পড়বে না। দিন আগত ঐ। এখন যেন কেউ না শুধায়, রাজাবাবু তুমি কই। সাধুর নয় দিন, চোরের এক দিন। তোমার কাল-নবরাত্রি কাটবে! দিল্লী দূরে কলকাতা কাছে।"

রাজাবাবু সে ছবির দিকে চেয়ে দেখে বলাইকে বলেন, সত্য স্বপ্রকাশ।

—সত্য মানে সত্যসখা দীঘড়ি।

—না না, সত্য, ট্রুথ।

—অ—!!

—সত্য স্বপ্রকাশ। সরকার বদলে কি করবে? এ তল্লাটে আছি আমরা, থাকব আমরা।

—গভীর জ্ঞান আপনার।

—আর কি বলবে?

—প্রভঞ্জনদের কথা। ওদের বিষয়ে আমাদের কি নীতি, তা বুঝি না তো?

—আমি ওদের সমর্থন করি।

—অ্যাঁ।

—সমর্থন করি। কেন করি? কেননা আমি ক্ষমতায় নাই। সমর্থন করি এই জন্য, যে ওদের শত্রুতা চাই না। আর ওদের আন্দোলন চলছে বলে কর্তারা চিন্তিত, তাতে আমাদের ফায়দা উঠছে।

—এর পর—?

—ক্ষমতায় এলে পিঁপড়ার মত টিপে মারব। হ্যাঁ, আমাকে ক্ষমতা দাও, সমর্থন তখনো করব। তা তো করবে না বাপ। আমাকে তো তোমরা দাগী করে রেখেছ। তবে কেন সমর্থন করব?

—তাহলে অবস্থা ভালই?

—খুব ভালো। রাম শ্যাম নিজেরা লড়ে দুর্বল হোক। আমরা গদি নিলাম বলে।

—গত নির্বাচনে আপনি তো বিরোধী ছিলেন।

—ছিলাম। বিরোধিতা করেছি, হেরেছি, অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি। আবার ফিরে যাব।

—অবস্থা তাহলে ভালোই।

—নিশ্চয়।

—ডাইনির ব্যাপারটা কি সত্যি?

—সে তুমি বুঝবে না। আমার স্বজাতের একটা লোক আমাকে সমর্থন করে না। এখনো তাদের ডাইনে সমর্থন নাই। আমার ভয়ে মেনে নিচ্ছে। এটা চালাতে পারলে ওদের বিশ্বাস আসবে।

—এলে পরে?

—তখন দেখো।

—প্রভঞ্জনকে টানতে পারতেন যদি।

—হাঁা, তাকে টানি আর সে আমার বিরুদ্ধে গিয়া চালাক। বেটা আমাকে মুখে "দাদা" বলে আর পিছন ফিরলে কত কথা বলে।

—সুবিধা হতে পারত।

বাপু হে! আমার চেয়ে রাজাপুরের লোকের উপর মাতঙ্গের প্রভাব বেশি। আর এখন তো হাওয়া বইছে। মাতঙ্গর কথা যদি বিশ জন মানে তো প্রভঞ্জনের কথা মানে তল্লাটে সবাই। এই যে "পরের ভালোই আমার ভালো" মার্কা লোকগুলায়, এরাই শান্তি থাকতে দিবে না। প্রভঞ্জনে তেমন ডরাই না, সে গরম হাওয়ায় উঠছে। মাতঙ্গ দেখ গা, নুনে চুনে জারিয়ে আছে। সে যে রাজনীতি করে না, সেই অনেক বাঁচোয়া।

—অশোক ছোঁড়াও মহা টেঁটন।

—খুব জানি। দীপক আছে, বিনয় আছে, কোন খবরটা পাই না বল?

—মনসুখলালের কাছে যাব।

—ভাল মনে করেছ।

—কাজ ছিল ?

—হতে পারে কাজ।

—আমাকে দিয়ে হয় না ?

—তোমাকে দিয়ে শুরু, শেষ করবে সে। তাকে জঙ্গলের ঠিকাদারি, কত টাকার কাজ দিয়েছি।

—সে তো মনে রাখে।

—বুদ্ধি আছে, তাই মনে রাখে।

মনসুখলাল এক বয়স্ক ঠিকাদার। এখানে সে লরিতে-ড্রাইভারে-মস্তানে এক সাম্রাজ্য রাখে।

—তুমি বাপু, রজনীকে একটু দেখ।

—আমার ক্ষমতা কি ?

—আহা স্বামীও ছেড়ে দিল। আর সোমরাইয়ের কাছে থাকলে তো রজনী অনাহারে মরবে। আমাকে তো বিশ্বাস করে না ওরা। কিন্তু আসত যদি, খানিক খাসজমি দিতাম, নয় টাকা দিতাম সে সঙ্গে কিছু। মউল নিয়ে মদ চুঁয়াত, পেট চলে যেত। দিগম্বর যখন জানত যে মার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই, তখন হয়তো মন তার ঘুরে যেত।

—দেখি, বলে দেখি।

—না শুনতে পারে। তখন সে নামালে চলে যাবে কোথা, কোন বিদেশে, আহা! যুবতী মেয়ে গো।

—বলব।

—বল, তোমাকে তারা ঘরের লোক বলে জানে। আমি তো বলি, দেখ। বলাইকে দেখ। আমাদের সমাজকে ভালবেসে সে জন্য কত সহজ করে দিয়েছে সব। দেখিয়ে দিয়েছে যে রাজনীতির পথে নয়, প্রেমের পথে আগাতে হবে। ভাল কথা, দীপকের কাজটা যেন হয়।

—হবে, আমি আছি।

এই সময়েই অশোক আরেকবারও পুলিসের চাকরি প্রত্যাখ্যান

করে। ফলে সত্যসখা দীঘড়ি অসম্ভব চটে যায়। ঝাঁকড়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, এবার নিয়ে তিনবার হল।

—তিনবার এক চাকরি?

—কি ভাবে কাঠখড় পুড়িয়েছি তা জান?

—প্রাথমিক শিক্ষক করে দিন না।

—জানো তার স্কেল কি এখন? বদমাশিতে ভরে গেছে সব। দরকারে হাজার হাজার টাকা ঘুষ দেবে এ কাজের জন্যে। যে দিতে পারবে, সে নিশ্চয় অভাবী নয়।

—সত্যদা!

—কি? যাচ্ছেতাই ছেলে তুমি—

—ঘুষ দেবার লোক থাকে কি করে?

—এই ব্যবস্থা—

—ঘুষ নেবার লোক আছে বলেই তো।

—নিশ্চয় আছে।

—তা হলে?

—হ্যাঁরে বাপু জানি। তুমি বলবে, সর্ষের মধ্যেই ভূত। আমরাও সবাই সাচ্চা নই।

—আমি কিছু বলছি না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যা করলে—ভালো কথা রাজাপুরের ব্যাপারটা কি? সোমরাই জমি পেতে সকলের এত দৌড়-দৌড়ি লেগেছিল। এখন তো সবাই চুপচাপ।

—দেখব।

রাজাপুরের লোকগুলি অশোককে এড়িয়ে যায়। বলে, জমি আমাদের হবে না গো। হলেও মুশকিলে পড়ব।

—তার মানে?

—এ কথাও আমরা জানি যে তুমি পারবে না জমি দিতে। সে ক্ষমতা রাখে অন্য লোক।

—কেউ বলেছে কিছু ?

—আমাদের ? না, কে বলবে ? আমরা আছি কি নাই কার মনে থাকে ?

—এ কেমন কথা হচ্ছে ?

—কত কি হয়ে গেল, মাতঙ্গ থানায় ডায়েরি করল তা থেকে হল কিছু ?

অশোক মাতঙ্গের কাছে যায়। মাতঙ্গ ভুরু কুঁচকে থাকে। তার পর বলে, না। জানতে চাস না।

—কেন ?

—জেনে কি করবি ?

—আমি কি কিছুই করতে পারি না ?

—না। অপর পক্ষের শক্তি অপার ! তুই কে ? তোর পার্টির ছেলে। এখানে তোর পার্টির জোর কত ? তার ওপরে এখন জঙ্গলখণ্ডের গরম হাওয়া।

—বল, বল তুমি।

—থাম বাপু, আগে টাটানগর যাব।

—কে ?

—জানতে যাব দিগম্বর রজনীকে ছেড়ে দিল কেন ?

—দিগম্বর ? রজনীর বর ?

—হাঁ, সেই লোক।

—তার মানে ?

মাতঙ্গ চাপা রাগে গর্জে ওঠে। বলে, ডাইনের ব্যাপার মনে পড়ে ? রাজাবাবু, মণি, লখিন্দর, গোপালীকে ডাইন করল, তা জানিস ? না, তোমরা বড় কাজের মানুষ, ছোট কথা কানে যায় না। ডাইনে বিশ্বাস করে অতি অশিক্ষিত। শিক্ষিত লোকে বলে, না না। ওসব বিশ্বাস কোর না। এ ক্ষেত্রে চার পাঁচ জন শিক্ষিত ধনী লোক ডাইনের প্রচার দিল। তারপর তাদের একঘরে করল। তার আগে মারপিট

করল। তোদের রাজ নয় এটা, রাজাবাবুর রাজ চলে হেথা। তাতেই তার এমন দবদবা।

—আমি জানি·সব।

—জানতে চেয়েছ কখনো? আর আমি শালা আরেক অক্ষম হই! থানায় লিখলাম, কলকাতায় আর্জি পাঠালাম, না! কোনো জবাব নাই।

—তারপর?

—তুমি কি করবে নিজে ভাব গা।

—তুমি?

—আমি দৌড়াই টাটানগর। তা বাদে শালা সকল গ্রামে ঘুরব আর সত্য কথা প্রচার দিব।

—দীপক জানে?

—খুব জানে। ডাইন হতে পয়সা পিটবার ব্যবস্থা সেও করে নেয়, সে জানবে না?

—পয়সার ব্যবস্থা?

বলাই আছে, বিনয় আছে, ভাবনা কি?

বিনয় অবশ্য অশোকের কথার প্রতিবাদ করে। সে তো কিছু করছে না।

—আপনারা কি করছেন দীপককে নিয়ে?

—প্রেতোৎসবের সময়ে রাজাবাবুরা এক দিক সামলায়। বিনয়রা সামলায় আর এক দিক।

বিনয় কাটা কাটা রুক্ষ গলায় বলে, ডাইনি বিশ্বাসের উপর সেমিনার করছি।

—কেন?

—তা তোমার বোঝার ব্যাপার নয়। ফিল্ডওয়ার্কাররা গ্রামে

গ্রামে কাজ করছে। তারা প্রচুর তথ্যপ্রমাণ এনে ফেলেছে। বিদেশ থেকে লোক আসছে, দিল্লী-বম্বে ও হায়দ্রাবাদ লোক পাঠাচ্ছে।

—এ সব আমি জানি বিনয়দা। দীপককে টেনেছেন কেন? না কি রাজাবাবুর "ডাইনি ধরো" অভিযানে আপনিও আছেন? তাঁর জমির ধান্দা, আপনার?

—আমার আগ্রহটা জানার ইচ্ছায় সীমাবদ্ধ।

—জঙ্গলখণ্ড আন্দোলনে আমাদের সমর্থন নেই। কিন্তু, যেখানে জঙ্গলখণ্ড চলছে, সেখানে ডাইনি নিয়ে সেমিনার আর বিদেশী ও দেশী বদমায়েশ আসা খুব দরকার?

—অশোক, এটা তোমার বেয়াদপি হচ্ছে।

—জানি। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হচ্ছে। আপনি কি করছেন তা আমি ধরে ফেলেছি।

—এতে মোটা টাকার ব্যাপার আছে।

—তুমি জানো এতে ডক্টর শোভন দেবমল্লিক রায় আছেন? তুমি জানো তিনি কে? তাঁর মতো লোক আছেন যেখানে, সেখানে তুমি এ রকম রুচিহীন ভাষায় কথা বলো কি করে?

—আপনি গ্রামে গ্রামে ফিল্ডওয়ার্কার পাঠিয়েছেন? দীপক কি তাদের মধ্যে আছে?

—দীপক প্রোজেক্ট অফিসার।

—বিনয়দা, এ কাজ করলে আমরা ভীষণভাবে বাধা দেব। আপনি জানবেন, কোনো কোনো সময়ে সমাজের লোকজনকে সহজে টানা যায়। সময়টা তো ভালো নয়।

—কি করবে তুমি?

—দেখবেন। অন্তত খবরের কাগজের খবর করে ছাড়ব। আর জানবেন ভীষণ একটা কাণ্ড বাধাব আগে।

—এটা কি বলছ তুমি?

—আপনারা এক জাতের লোক হয়ে গ্রামে গ্রামে বিষ ছড়াবেন

আর কাজ হাসিল করে বেরিয়ে যাবেন তা হতে দেব না। কিছুতে নয়। কোন্ আদিবাসী সমাজকে বাইরের চোখ তুলে ধরছে আপনার সমিতি? তারা ভূতপ্রেত ডাইনি নিয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকে? সে সমাজটা থাকলেই আপনাদের ভালো, তাই না? আর যে আদি-বাসী সমাজে তবু শিক্ষা ছড়াচ্ছে, যারা এমন টালমাটালেও অগ্রগতির কথা ভাবছে, তারা কি নেই?

—তোমার সঙ্গে কি কথা বলব?

—আমি আপনার তুলনায় অশিক্ষিত তাই না? চুপ করে গেলেন কেন? এটা কি আপনার মনে হয় না যে আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত লোক আর রাজাবাবুর মতো লোক জাতে এক? এক জাতের মানুষ হয়েও আপনাদের সঙ্গে মাটির মানুষের কোনো যোগ নেই?

—যত যোগ আছে তোমাদের?

—আপনার চেয়ে বেশি আছে। অন্তত নিজের সমাজের অন্ধকার দিকগুলো ভাঙিয়ে আমরা বিদেশী পয়সা নিই না। যাক্! মাতঙ্গদাদা ডাইনের কথা নিয়ে ক্ষেপে গেছে। তার মুখ থেকে প্রভঞ্জন দাদার কানে যাক। তখন ম্যাও ধরবেন, বোঝা যাবে কতটা এলেম ধরেন।

বিনয় গুম হয়ে থাকে। প্রভঞ্জন! শেষ অবধি প্রভঞ্জন। 'ইস্পাত' ট্রেন ধরে কলকাতা যেতে হবে। এখন ডক্টর শোভনকে দরকার। বিনয় কে? শোভনই সব।

শোভন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। বলে, না না! ওখানে হবে না সেমিনার।

—কোথায় হবে?

—এখানে।

—এখানে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নো প্রচার, নো খবরের কাগজ। কয়েকটা তোমাদের জাতের লোকের নাম, কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি। ব্যস্।

এ ভাবেই মূল্যবান সেমিনারটি হয়েছিল। বিশাল এক হলঘরে সবশুদ্ধ তেরো জন লোক ছিলেন। শোভন এর এক ব্লুপ্রেণ্ট বিদেশে পাঠায়। তাতে বহু অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নাম ছিল। বিদেশের কর্মকর্তারা দেখে খুশি হন যে এতজন আদিবাসীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা গেছে। নামগুলি ভূয়া। তবু প্রভূত অর্থসাহায্য আসে।

বিনয় এ সব জানতে পারে নি। সে সেমিনারে একটি রেকসিন ফোলিও এবং একটি কলম পেয়ে খুশি হয়ে ফিরে যায়।

দীপক আর ফেরে নি। শোভন তাকে সিধা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে।

রজনী তখন কি করছিল।

॥ ৬ ॥

রজনী তখন বলাইকে বলছিল, খিদের জ্বালা আর সইতে পারছি না। দাও, জমি দাও। মউল কিনে মদ চুয়াব, সে ব্যবস্থা করে দাও'

এত দুঃখেও রজনী দেখতে হঠাৎ খুব চোখে লাগার মতো সুন্দরী হয়ে ওঠে। দিগম্বরের জন্যে তার বুকে এখন অপার তৃষ্ণা। এত ভালবাসা ফেলে সে কোথায় গেল, সেই কথাই রজনী ভাবে। ভাল-বাসার আকুলতা তাকে সুন্দর করেছিল।

মা আর দাদা যে তার চিন্তাতেও খুব কাতর হয়ে থাকে, তা সে বুঝত। তার মনে হত, ওঃ। আমি যদি ছেলেটাকে নিয়ে সরে যাই তা হলে মা বাঁচে, দাদা বাঁচে।

দাও না, জমি দাও না—এ কথা সে বলাইকে বলত। দাদা জানলে সর্বনাশ। সোমরাই বলত, না যাবি ওর কাছে না ওর সঙ্গে কারো কাছে। দেখ। ও হল রাজাবাবুর চামচা। রাজাবাবু এখন

মনসুখলালের মস্তানদের সঙ্গে সর্বদা পরামর্শ করে। না জানি নতুন করে কি মতলব করছে।

রজনী মাতঙ্গর কাছে যেত না আর।

কেন যাবে? মাতঙ্গ কেন টাটানগরে দিগম্বরের খোঁজ পেল না? সে কেন ডাইনের কথা জনে জনে বলে বেড়াচ্ছে? কি হবে? ছুটাছুটি তো অনেক হল লাভ হল কিছু?

রজনী অশোকের কাছেও যেত না।

কেন যাবে? অশোক বা কি সমাধানটা করল? ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাল, থানায় ঘোরাঘুরি করল, লাভ হল কিছু? সেই তো তারা একঘরে হয়ে আছে।

মণি বলত, ডাইনি আমি? ডাইনি। ডাইনি কেন হব? এতকাল হলাম নাই যখন? সরকারের দয়াতে ছেলের কাজ হল, জমিটা পেলাম, তাতে ডাইনি আমি?

সোমরাই রজনীর মাথায় হাত রেখে বলত, মা যে বেঁচে আছে। নইলে জমি বেচে দিয়ে টাউনে চলে যেতাম।

রজনী ভাবত, দাদাটা কি বোকা রে! টাউনে কি রাজাবাবু নেই? টাউনও তো রাজাবাবুর। এই শহর, তেল ও কাগজকল, পথঘাট, শাল গাছ কেটে ফেলার খটখট শব্দ, করাতকল, আশপাশের শস্যক্ষেত্র, ডুলুং ও সুবর্ণরেখা, সবই যে রাজাবাবুর প্রয়োজনে বিদ্যমান, তাতে রজনীর কোনো সংশয় ছিল না।

শাল গাছ ঢাকা উদ্যানে মাঝে মাঝে প্রভঞ্জনরা সভা করত। ট্রাকে চেপে মানুষ আসত। টাউনের পথে পথে ধম্‌সা মাদল বাজিয়ে মিছিল হত।

সব কিছু রজনী দেখত সস্নেহ প্রশ্রয়ে চেয়ে চেয়ে। ওরা করছে এ সব, করুক। কিছুই করতে পারবে না। সব যে রাজাবাবুর হাতে কেনা-বেচা, বেচাকেনা হয়ে আছে। বিশ্বভুবনই তো রাজাবাবুর।

বিশ্বভুবন কেন রাজাবাবুর?

কেন নয় বলো? বিশ্ব কি? ভুবন কি? মণি, সোমরাই, রজনী, লখিন্দর, গোপালী, ভরত, পার্বণী, বিলাতিদাসী, উদ্ধব, বেলুনচাঁদ, গোকুল, এই সব একেকটা মানুষই তো মহাবিশ্ব। তাদের জীবনের সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা, চাওয়াপাওয়া, তাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী ব্যাপার। তাদের জন্যেই তো সরকারের এত পরিকল্পনা, এত আইন, এত টাকা ঢালা, এত কার্যসূচী প্রণয়ন করা, সে কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্যে এত এত অফিসার আর দপ্তর। দেশে এরা কতো গুরুত্বপূর্ণ তা কি বোঝা যায় না?

তাদের জন্যেই তো তিলকা মাঝি-সিধু-কানু-বীরসার লড়াই, তেভাগা-হাটতোলা-খাদ্য আন্দোলন-নকশালবাড়ি—আজ অপারেশন বর্গা-ভূমিহীনকে ভূমিদান-শিক্ষা বিস্তার। রাজ্যের ভিতরে বাইরে কৃষিক্ষেত্রে জঙ্গলে কলকারখানায় এত চঞ্চলতা। এরা কতো গুরুত্বপূর্ণ তা কি বোঝা যায় না?

এদের জন্যেই তো বিশ্ব ব্যাঙ্কের এত টাকা ঢালা। এদের জন্যেই তো কতো ভারতীয় সংস্থা-সমিতি গবেষণা সংস্থা-কল্যাণকারী সংগঠনের মাথা ব্যথা আর তার পিছনে এত ফ্রাঁ, বেলজিয়ান ফ্রাঁ, ক্রোন, জার্মান মার্ক, লিরা, নরওয়ের ক্রোন, ক্রোনা, আন্তর্বিশ্ব মুদ্রার নায়াগ্রা জলপ্রপাত প্রবাহ। বিশ্বের ক্ষেত্রে এরা কতো গুরুত্বপূর্ণ তা কি বোঝা যায় না?

এদের জন্যেই তো কতো সাহিত্য, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, পত্র-পত্রিকা। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরা কম গুরুত্বপূর্ণ?

এই পৃথিবী এদের হবে, সেই জন্যেই সূর্যের সঙ্গে আরেকটি নক্ষত্রের সংঘাত হতে চলেছিল আর সেই থেকেই জন্ম নেয় পৃথিবী। আজও ঘণ্টায় ছেষট্টি হাজার মাইল বেগে সূর্যকে ঘিরে পাক দিতে দিতে পৃথিবী সূর্যকে ঘেরাও করে রাখে আর মনে করিয়ে দেয়—

—রজনী দিগম্বরের কাছে সুখে থাকবে, ওদের ছেলে উঠোনে খেলবে, এমন কথা ছিল।

—ভরত আর পার্বণী, বিলাতিদাসী আর উদ্ধব, যে যার মতো জোন খেটে ঘরে এসে বসবে এমন কথা ছিল।

—মণি তার ঠাকুরঠুকুর পুজো করবে, সোমরাইকে ভাত রেঁধে দেবে, এমন কথা ছিল। কথা ছিল সোমরাই তার এক টুকরো জমির দিকে যতবার চাইবে, বুক তার ভরে উঠবে ধান-মাটি-রবিশস্যের গন্ধে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘেরাও করে ঘোরে আর বলে, তা যখন হচ্ছে না, তাহলে আমার এত পরিশ্রম কেন?

সূর্য নিরুত্তর থাকে আর প্রচণ্ড নিরুত্তরতায় জ্বলে আর তাপ বিকিরণ করে।

রাজাবাবু আছে যে, রাজাবাবু আছে না? রাজাবাবুর বয়স যে কয়েক কোটি বছর হয়ে গেল। সে আছে বলেই তো এমন সব দরকারী কাজ হয়ে উঠছে না।

বিশ্বভুবন সেই জন্যেই রাজাবাবুর। কেননা এই বিশ্বের সব চেয়ে দামী মানুষ যারা, তাদের জীবন সে নিয়ন্ত্রণ করছে।

রজনী সব মেনে নিয়েছিল। বস্তুত মণি, সোমরাই, রজনী, লখিন্দর, গোপালী, এরা সবাই একটা বিশেষ মানসিক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রেতোৎসব যখন শুরু হয়, তখন তার মধ্যে ঘটনা দ্রুত ঘটেছে, মানুষগুলিকে দৌড়াতে হয়েছে, হাসপাতালে, থানায়, মাতঙ্গের কাছে। যখন এমন প্রবাহ থাকে, যখন মনে আশা থাকে যে দুঃস্বপ্নের রাত কাটবে। ভয়ঙ্কর দাম নেবে নির্যাতিত মানুষগুলির কাছে. তবু কাটবে।

তারপর কত দিন গেল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গেল। দুঃস্বপ্ন কাটল না। শেষ অবধি আরো আরো দিন গেল। এখন রজনীরা জানে যে তারা চিরকাল একঘরে হয়ে থাকবে, চিরকাল রাজাবাবুর গ্রামে, তাদের ঘরের কাছের সরকারী কুয়ো থাকতেও অনেক দূর থেকে জল আনতে যাবে।

জেনে তারা নিজেদের ভিতরে কোনো খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। আগে নির্যাতনের কথা বলে নি, রাজাবাবুর ভয়ে। এখন বলে না, প্রতিকার পাবে না যখন, ভেজ্ঞভেজ্ঞ করে লাভ নেই বলে। এখন তারা কাজ করে, দোকানে যায়, টাউনে যায়, বাজারে যায়, সবই করে। যারা কথা বলে, তাদের সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু মনে মনে তারা জেনে গেছে যে এই দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ, এই সব চেনা মানুষ, এদের সঙ্গে তাদের সত্যিকারের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা আলাদা।

এমনভাবে ভাগ্যকে মেনে নিলে যে উদাসীন প্রশান্তি মুখে চোখে ফুটে ওঠে রজনীর মুখে তাই লেখা থাকে। মাঝে মাঝে সে স্টেশনে দাঁড়ায়। উদাসীন চোখে ট্রেনের চলা ও থামা দেখে। এমনই কোনো ট্রেনে চেপে তার স্বামী দিগম্বর চলে গেছে কোথায়! রজনীও যেত। কিন্তু বিশ্বভুবন, সবই যে রাজাবাবুর, সে যাবে কোথায়? দিগম্বর রাজাপুরে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিল যখন, তখন থেকেই তো রজনী ওর নির্বাচন করা বউ। বিয়ে পরে হয়।

খুব ধমুসা বেজেছিল, খুব নাচগান হয়েছিল। রাজাবাবুর কাকিমা রাইমণি ওকে লাল শাড়ি দিয়েছিল। দাদা বলেছিল যে কয়েক বছর বাদে একটু সোনা দেবে।

রজনা দিগম্বরকে বলত, নাই দিতে পারল কানে সোনা? তাতে কি? তুমি আমার গায়ের গহনা।

দিগম্বরের শখে রজনা নাক বিঁধায়। এখন নাকে নিমকাঠি, নাক শুকালে নাকছাবি। হাটে বাজারে কেমিক্যালের নাকছাবি মেলে। তা আর পরা হয় নি রজনীর। তার আগেই সব যেন ছিটাভিটা হয়ে গেল।

রজনীরা পাতাগীত গাইত,—

এত বড় মুলুকে

ই—

নাম হল রাজদা ভাদ—

রাজদা সরসতী গুসাচি আখড়া

শালুক ফুল তিরি ভাদ মায়া ছাড়িল ॥

রাজদহ গ্রামের ভাদো শালুক ফুলের মতো সুন্দরী বউয়ের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। নতুন পাতা ভরা কুসুম গাছের মতো, বর্ষাগমে ডুলুংয়ের জলের মতো উচ্ছল রজনীকে ছেড়ে দিগম্বর কোথায় গেল? তার কুসুম গাছ শুকায়, আষাঢ়িয়া ধানে সিটা পড়ে। ডুলুংয়ের জল বালিতে লুকায়।

অরণা জরণা ঝরণা জ্বালা রে

ভর যউবনের বেলা তিরির জ্বালা ॥

গহন বনে ঝর্ণা খুঁজে ফেরা বড় জ্বালা। ভরা যৌবনে প্রিয়তমকে না পাওয়া বড় জ্বালা।

রজনী দাঁড়িয়ে থাকত স্টেশনে, আর ভাবত। সোমরাই সেখানে এসে তাকে ধরত। রজনী, সোমরাই, মণি, লখিন্দর, গোপালী, এরা যখন পরস্পরের কাছে আসত, তখন ওদের মধ্যকার খোলস ছেড়ে আসল মানুষটা দেখা দিত। যে মানুষ উদ্বেগে, মমতায়, রাগে, দুঃখে, ভালোবাসায় স্বাভাবিক।

সোমরাই রজনীর হাত ধরত। বলত, যা ভেবেছি ঠিক তাই। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকিস যে অমন করে, কে ক'বে ধরে চালান দিয়ে দিবে। এমন কত হয়।

—ট্রেন দেখি রে দাদা।

—অমন করে শুসাস্ না রজনী। তোর তো কোনো দোষ নাই। মাতঙ্গ দাদা আশা ছাড়ে নি। ঠিক তাকে এনে দিবে। ঘরে চল্ বোন।

—চলো।

ওরা যখন ঘরে ফিরত, তখন কার্তিকা শিশির পড়ছে। সব যেন হিম হিম।

এ ভাবেই চলছিল সব, হয়তো চলতও। কিন্তু হঠাৎ একদিন, বলাই রজনীকে ডেকেছিল।

—চলে আয় তুই সাঁঝের বেলা।

—কেন ?

—কথা আছে।

—কি কথা ?

—সে রাজাবাবু বলবে।

—তার সন্ধান পাওয়া গেছে ?

—হ্যাঁ রে। শুনলাম যে সে রাজাপুরে আসবে নাই। তা না এল। তোর সাথ দেখা করবে, তা বাদে তোরে নিয়ে চলে যাবে।

এ হেন আনন্দের খবর বলাই খুব শুকনো মুখে, অনেক থেমে থেমে তবে দিয়েছিল। রজনী যদি অমন বিহ্বল হয়ে না পড়ত, তা হলে ঠিকই বুঝতো যে কথাগুলি অসত্য। সে তা বোঝেনি আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

—ছেলে নিয়ে যাব তো ?

—তুই তো আয় আগে। তা বাদে ছেলের ব্যবস্থা হবে। তোর ছেলে, তুই পরে নিবি। আর এক কথা, এ কথা কাউকে বলিস না।

—না বলব না।

—সোমরাই না জানে।

—না, সে জানবে না।

রজনী তাড়াতাড়ি কাঠের বোঝা টাউনে নেয়। মুনশিরাম, খোদন, প্রহলাদ গ্রামের আরো কয়েকজন দেখে রজনী ও বলাই কথা বলছে।

রজনী কথাটি চেপে রাখতে চায়, পারে না। মা গো! চৈত্র থেকে অঘ্রাণ, কতদিন হল? অনে—ক দিন। কাঠ আজ সে তাড়াতাড়ি বেচে দেয়। তারপর চেনা দোকানে ধার করে সাবান কেনে, মাথার তেল। ঘরে ফিরে খুব ভালো করে স্নান করে আবার সুদূর গ্রামের কুয়ো পাড়ে গিয়ে। তারপর ঘরে এসে নিজেই ভাত রাঁধে।

মণি ওকে সন্দেহের চোখে দেখে।

—হ্যাঁ রে, তোর কি হয়েছে?

—কি হবে?

—এমন ছনমন করছিস?

রজনী হেসে ফেলে। তারপর গরাসে গরাসে ভাত খেয়ে বলে, মা! মাসির ঘরে যাই একটু।

পার্বণী তার মাসি, তাকে মানুষ করেছে সে। এই দুঃখের দিনে পার্বণী, বিলাতিদাসী, ভরত, এরাই ওদের দেখেছে। পার্বণীকে দেখে রজনী তাকে জড়িয়ে ধরে।

—কি হল মা! এমন আনন্দ আজ?

রজনী আর চেপে রাখতে পারে না খবর। খানিক হেসে খানিক কেঁদে সব বলে।

পার্বণী বলে, কথা তো ভালো রে মা! কিন্তু খবর আনল যে, যাবি যার কাছে, ভেবে দেখেছিস?

—তুমি আর "না" বোল না মাসি। যেয়ে দেখি না। তা বাদে মা আর দাদাকে বলব তখন?

—যাবি তবে? আমি সঙ্গে যাব?

—না মাসি। তাতে মন্দ হবে।

—তোর তরে ডর লাগছে।

—না না মাসি। আমার মন বলছে এ খবর ভাল খবর। আমি তো তোমার জামাইকে জানি গো মাসি। সে লোক চাঁদ সূর্য না দেখে থাকতে পারে, আমাকে না দেখে থাকতে পারে না। আমার দিব্য রইল, তুমি কারেও বলবে না।

পার্বণীকে বলতে পেরে তবে যেন রজনীর মনটা শান্ত হয়েছিল। ঘরে এসে সে কতদিন বাদে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়েছিল আর গান গেয়েছিল।

ধন ধন ধন
যাইও না রে বন
ঘরে বস্যে বনাই দিব
রতন সিংহাসন ॥

আর বিকেলের সূর্য হেলতে মাকে বলেছিল, সই চলে যাবে মা। যাব আর খানিক থেকে চলে আসব। সই বলেছে মুড়ি ভাজবে মুড়ি খেয়ে আসব।

কাচা কাপড় পরে, তেল মেখে মুখ চকচকে করে, চুল বেঁধে রজনী বেরিয়েছিল। কোমরে দস্তার গোট, হাতে দস্তার চুড়ি, রজনী খুব সেজেছিল।

ঘরে ফিরে সোমরাই বলে, রজনীকে যেতে দিলি কেন? এখন তার মনের ঠিক নাই যখন?

—সই তো তার রাঙ্‌নাডিহির বাতাসী। রাঙ্‌নাডিহি তো এখানেই। দেরি হলে নয় আমি ডেকে আনব। মুখ কালো করে থাকে, তাতে ভাবলাম যেতে চাচ্ছে তো যাক।

—কোন সই বললে?

—বাতাসী।

—বাতাসী তো পরশু চলে গেল শুশুনিয়া।

—সে কি বলিস?

—আমি যেন তাই শুনলাম। দাঁড়াও, দেখি খানিক। ওর হয়েছে মাথা খারাপ। সব সময়ে কি ভাবে, পথ চলে যেন কোনো হুঁশদিশা নাই। ওকে নিয়ে আমার হয়েছে মহা চিন্তা। ইদিকে বকতে ঝকতে ভয় পাই। কি জানি কি করে বসে।

সন্ধ্যা পেরোয়, রাত গড়ায়, রজনী ফেরে না ঘরে। সোমরাই প্রথমে "যাকগা যেথা খুশি" বলে বসে থাকে। তারপর মনের উদ্বেগেই ধোঁয়াটে লন্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময়ে পার্বতীকে ডেকে বলে, মা একা রয়েছে। একবার যেয়ে বোসো খানিক।

—এখন গেলে আর ফিরতে পারি? একে রাতে চক্ষে দেখি না, তায় হোঁচট খেতে খেতে যাব?

—নয় ভাত নিয়ে যাও! চলো, পৌঁছে দিয়ে যাই। ওখানেই থেকো রাতটুকু।

পার্বণীকে পৌঁছে দিয়ে সোমরাই চলে যায়। রাঙ্‌নাডিহি খুবই কাছে, এক মাইলের মধ্যে।

অনেক পরে ফেরে সে। সঙ্গে থাকে খোদন। খোদনের ব্যাপার যে বানানো ব্যাপার, রাজাবাবুর নির্দেশে তৈরি, এ কথা খোদন বেশ কয়েক মাস আগেই তাড়িখানায় স্বীকার করেছিল আর নেশার বশে আলগা হয়ে সোমরাইয়ের হাত ধরে কেঁদেছিল। সেই থেকে দিনেমানে না হলেও সন্ধের পর লুকিয়ে চুরিয়ে খোদন দু'-একবার এসেছে।

এখন সোমরাই খোদনকে নিয়ে দাওয়ায় ওঠে। বলে, মা! যা বলেছি তাই। বাতাসী তো নাই। তার বোন বলল, রজনী না কি আতিপিতি প্রায় দৌড়ে টাউনের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু খোদন যে বলে অন্য কথা।

—কি বলে? কি বলে অ সোমরাই?

—চুপ চুপ! চেঁচাস না মা। বলে যে বলাইবাবু রজনীর সঙ্গে কি বা কথা বলছিল। আরো অনেকে দেখেছে। একি হল মা?

পার্বণী এখন হুহু করে কেঁদে ওঠে।

—তুমি কাঁদছ কেন?

—সে যে জামাইয়ের কাছে যাচ্ছে বলে গেলরে। বলাই তাকে সেই খবরই দেয়। সে বলল—

পার্বণীর কাছে সব শুনে খোদন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। সোমরাই বলে, আমি যাই বলাইবাবুর কাছে। না কি রাজাবাবুর কাছে যাব টাউনে?

খোদন মাথা নাড়ে। বলে, সোমরাই রাজাবাবুর কাছে যাস না।

রাতে গেলে সে তোকে টাউন থেকেই থানায় পুরে দিবে। আজ রাত অনেক। মাতঙ্গ দাদার কাছে যা।

সোমরাই হঠাৎ হাহাকার করে কেঁদে ওঠে ও নিমেষে শান্ত হয়। তারপর বলে একা যাব!

—আমি যাই ?—পার্বতী ভীরু গলায় বলে।

—রাতকানা বুড়ির কাজ নয়. বেটা ছেলে চাই।

—লখিন্দরকে ডাকি ;

—চল আমি যাব।

খোদন বলে তারপর বলে, যা হয় হবে। চল আমি যাব। সে একঘরা করবে ? একঘরা করলে মানুষ মরে না। তোরা বেঁচে যাছিস!

—তাই চল সোমরাই নিশ্বাস ফেলে বলে, যেন আজ খোদনের সঙ্গে যাবার ব্যাপারের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়।

—মা মাসি! কেউ যেন জানে না

মাতঙ্গ ওদের দেখে অবাক হয়। দুজনকে রাতে আটকে রাখে পার করে। মুড়ি জলে ভিজিয়ে ওরা খায়। তারপর ভোর না হতেই ওরা যায় বলাইয়ের বাড়ি।

বলাই অস্বীকার করে।

—আমি কখন তার সঙ্গে কথা বললাম।

খোদন শুকনো ঠোঁট চেটে নেয়। তারপর বলে, কাল বলছিলে। আমরা অনেকে দেখেছি। আগে দাঁড়িয়ে কথা কইলে তারপর উবু হয়ে বসলে। অনেকক্ষণ বলেছ। তখন বেলা বারোটা হবে। ওই ডাঙনাডিহির মোড়ে বটগাছের নিচে

—কি বলেছিলে ? কোথায় যেতে বলেছিলে ?

—এমনি কোনো কথা বলে থাকব—মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে বলাই খুবই বিব্রত হয়।

—না। আমার বোনকে তুমি "এমনি কোনো কথা" বলনি।

বলেছ যে তার বর এসেছে। সাঁঝের বেলা রাজাবাবুর কাছে গেলে দেখা হবে। আমাকে বলতে বারণ করেছে, ছেলে সাথে নিতে বারণ করেছ। এতগুলো কথা বলে ভুলে যাচ্ছ? সে সর্বস্ব কথা পার্বণী মাসিকে হেসে হেসে বলে গেছে।

মাতঙ্গ বলে, কাল? রাজাবাবুর বাড়ি? সেখানে কাল সন্ধেয় বাড়ির কেউ ছিল না। ঠিকেদারের মস্তানরা তাস খেলছিল। আমি জানি রাজাবাবু তো ফিরল আরো পরে।

—কি হল তার, বলাইবাবু?

—আমি জানি না।

মাতঙ্গ বলে, আগুনে এক পা, জলে এক পা রেখে অনেক দিন চলছ তুমি। এবার তার দাম দেবে। চল্ সোমরাই। একবার তো ঘরে যেয়ে দেখি। তারপর ব্যবস্থা করছি। এবারে তুমি বুঝবে।

বলাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বলাই মুর্মু!

কথাগুলিতে থুথু মাখিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে মাতঙ্গরা বেরিয়ে আসে এখন রাজাপুর যেতে হবে।

রাজাপুরে রজনী ফেরেনি। ওরা শহরে আসে আবার। অশোব ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। থানায় রজনী যে নিখোঁজ সে বিষয়ে ডায়েরি লেখানো হয়।

সমগ্র ঘটনাটি ক্রমে রাজাপুর গ্রামে টাউনে, অন্যত্র এক অদ্ভুত রকম চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। রাজাপুরে যারা রাজাবাবুর ভয়ে সোমরাইয়ের সঙ্গে খোলাখুলি সম্পর্ক রাখেনি তারাও খোঁজ করতে নেমে পড়ে।

প্রেতোৎসবের এই পরিণাম রাজাবাবুর মনের মতো হয় না সোমরাইদের শত্রু বানাবার চেষ্টা করে কি এই লাভ হল? প্রতিদিন পার্বণী ও মণি বুক চাপড়ে কাঁদছে। গ্রামের সবাই তাদের বাড়িতে এ কি হল? থানায় যেতে হয় একবার।

পাঁচদিন বাদে থানায় বেশ বড়সড় একদল আসে। একই দাবিতে প্রভঞ্জন, মাতঙ্গ, অশোক, এবং রাজাপুরের জনাদশেক লোককে দেখে থানার বড়বাবু প্রমাদ গণে। বড়বাবু জানে, ঐক্য নয়, বিভিন্ন দল ও মতের মানুষের মধ্যে প্রবল অনৈক্যই থানা ও পুলিসের শক্তির উৎস। রজনীর নিখোঁজ হবার ব্যাপারে এমন ঐক্য কেন? এর মানে কি? বলাইকে এরা প্রায় ধরে এনেছে কেন, তাও বোঝা যায় না। বড়বাবুর মনে সংশয় দেখা দেয়। তবে কি রাজাবাবুর সূর্য এখন অস্ত যাচ্ছে?

—কি ব্যাপার?

প্রভঞ্জন কাটা কাটা উচ্চারণে বলে, রজনীর ব্যাপার। এই বলাই যা বলেছে, তার ওপর রজনী চলে গেছে।

—আমি কিছু বলিনি। এরা আমাকে মিথ্যে জড়াচ্ছে। রজনী কোনো ছেলের সঙ্গে চলে গিয়ে থাকবে। নয় তো নামালে চলে গেছে।

—ভালো ভালো। কিন্তু সাধু যে অন্য কথা বলছে। কি, চমকে উঠলে কেন? সাধুকে চেন না? রাজাবাবুর চাকর? সাধু হে বলাই। সে সেদিন ছিল। যখন তোমাকে রাজাবাবু সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

—সাধু তুই একাজ করলি?

—সমাজ বলছে রজনীর খোঁজ না মিললে গিরা চলবে। তোমার রাজাবাবুর, তারানাথবাবুদের ব্যবস্থা হবে। আমি কি সমাজের বাইরে হই না কি?

বড়বাবু বলে, এ সব কি কথা?

মাতঙ্গ বলে, এ সব কথায় তোমার কি? তুমি আমাদের দরখাস্ত নাও, কাজ দেখাও। তারপর আমাদের কথা, রজনীর খোঁজের ব্যাপারে থানার সাহায্য না পাই তো তার ফল ভাল হবে নাই।

—দেখছি।

—আর, এর কথাটাও লিখে নাও।

—এ কে?

—এর নাম রঘুনাথ। রাজাবাবুর বাড়ির পিছনের টোলায় এর ঘর। বলছে রঘুনাথ।

—লেখেন লেখেন।—রঘুনাথ ভুরু কুঁচকে বলে, যেদিন রজনী নিখোঁজ হয় বলছ, সেই পাঁচ তারিখ রাত দশটা নাগাদ আমরা মেয়ে-ছেলের চীৎকার শুনে বাইরে বেরোই। বাঁচাও গো, বাঁচাও বলে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা মেয়ে ছুটছিল, তার পিছনে দুজন লোক—

—কোথায়? তোমার বাড়ি ঠিক কোথায়? কোথা দিয়ে ছুটছিল? সব ঠিক করে বলো।

রঘুনাথ বলতে থাকে।

এরপর আর কথা চেপে রাখা যায় না। দলে দলে লোক রজনীকে খুঁজতে থাকে।

রাজাবাবুর রাজাপুরের বাড়ির জানলা বন্ধ থাকে। এতদিনে প্রেতোৎসবের উদ্‌যাপন হতে চলেছে বলে মনে হয়। ক্রমে উত্তেজনা বাড়ে।

রজনী কোনো ছেলের সঙ্গে যায়নি।

—সে নামালে খাটতে যায়নি।

—তার জামা কাপড় নিয়ে যায় নি।

—ছেলেকে সে নিয়ে যায়নি।

—কে তাকে নিয়ে গেছে?

—বলাই কার চামচা?

এই ক্ষিপ্ত কথাগুলি বলে বলে গ্রামবাসী রাজাবাবুর গ্রামের বাড়ির পাশের কুয়া থেকে জল নেয়।

তারপর রজনী ফিরে আসে।

রজনীর সব কথা রজনীই বলে দেয়।

কলেজের বিশাল বাগানের শেষ প্রান্তের পরিত্যক্ত এক কুয়ার পাড়ে কয়েকটি প্রত্যাশী শকুনকে বসে থাকতে দেখে প্রথমে লোকের নজর পড়ে।

কুয়োতে একটি গলিত শব।

পুলিস এলে শবটি তোলা হয়। তারপর ক্যানভাসে মোড়া খাটিয়াতে শবটি রাখা হয়। বেশ কয়েকদিন আগে মৃত বিকৃত এই শবদেহের পরনে জলপচা হলুদ শাড়ি, লাল জামা, কোমরে দস্তার গোট, হাতে দস্তার চুড়ি।

ভিড় জমে যায়।

মণি বলে, গলায় চৌকো পদক থাকবে। দস্তার চেন, তামার পদক।

—আছে।

—রজনী।

--গলায় নাইলনের দড়িতে ফাঁস।

এখন ছবিটি স্পষ্ট হয়, রজনী কথা বলে। ক্রমে ভীষণ নীরবতা নামে জনতার মধ্যে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকায়। সোমরাই নতজানু হয়ে দুর্গন্ধ শবের দিকে ঝুঁকে থাকে।

অনেকক্ষণ যায়।

পুলিস বলে, লাশ থানায় নিতে হবে।

সোমরাই মাথা নাড়ে। বলে, কাঁধে কাঁধে যাবে রজনী, শহর ঘুরবে রাজাবাবুকে মুখ দেখাবে, তার আগে থানায় যাওয়া নাই।

পুলিস ভাবতে থাকে, নিখোঁজ সাঁওতাল যুবতীর লাশ শহরে ঘুরানো আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টায় পড়ে কিনা।

সোমরাই মুখ তুলে স্বচ্ছ ও কঠিন চোখে মাতঙ্গকে, অশোককে, প্রভঞ্জনকে বিদ্ধ করে, বিদ্ধ করে তীরের ফলায়। তার চাহনিই এখন তীরের ফলা। তার চাহনি বলে—

—তোমাদের কি কিছু করার আছে? তোমরা কি কিছু করবে? তোমরা কি কিছু করবে?

মাতঙ্গ অশোক ও প্রভঞ্জন অস্বস্তিতে মাথা নামায়। সোমরাই এমন করে চেয়ে আছে কেন?

সোমরাই এবার সকলের দিকে চায়। তার চোখ বিস্মিত, সে যেন কি খুঁজছে।

তারপর সে মাথা নাড়ে। বলে আজ আমার পাশে কতজন, সবাই তোমরা কত ভালো। এত ভালো লোক থাকতে তবু আমার বোনকে মরতে হল কেন?

সবাই চুপ করে থাকে।

তারপর এগিয়ে আসে ভরত। সোমরাইকে বলে, উঠে পড় সোমরাই। আর কোন পথ যদি নাই তো শাল গাছে চাল আছে। আমরা গিয়া দিব।

সবাই মাথা তুলে চেয়ে দেখে। হ্যাঁ আছে, শাল গাছ আছে। তারপর ওরা এগোয়, রজনীকে ওঠায়।

পেতোৎসবের পর আরেক উৎসব প্রেত নিধনের উৎসব এভাবেই সূচিত হয়। এ রকমই নিয়ম।

ছুলমাহার মা

মহনি নাম হয় তার। এই ১৮১৫ সালের বৈশাখে সে জন ভগনা-ডিহি গ্রাম হতে দূরে যায় বনে। কাঠের সন্ধানে যায় সে। যাবার কালে কেউ যায় না সঙ্গে তার। কে জানে কি বিপদটা আসছে সন্তাল জগতে। তাতেই তো ঘরে ঘরে, মেয়েতে মেয়েতে সই পাতানো হল। মহনিও সই পাতাল। কে জানে কি বিপদ! হাটে যাও, বাজারে যাও, বিপদের কথা শুন। শেষে ঠিক হল, মেয়েরা সবাই সই পাতাও।

কেন গো কেন, সই কেন পাতাব? সই পাতালে তোমার বাপের ঘর—স্বামীর ঘর, আমার বাপের ঘর—স্বামীর ঘর, যে যেখানে থাকে সকলে হয় গো বন্ধু। হড়হপন আমরা, সন্তাল হড়, কি বা আঁধি আসে বোন। এখন মানুষে-মানুষে মেলবাঁধা দরকার।

হেসে দেখ গো! এ কেমন সই-পাতাপাতি? রাখালিয়া সন্তাল ছেলেরা একসঙ্গে গরু চরায়। গুলিডাব, কাঠিখেলা খেলে। তারা হয় মিতা। মেয়েরা করম পরবে এ-ওর মাথায় করমপাতা গুঁজে দেয়; তারা হয় এ-ওর কারামডার।

এখন অন্য হিসাবে সই পাতাপাতি চলে গো বোন! ঠিক আছে, তুমি আমার সই, আমি তোমার সই হলাম। আর সই হলাম যদি তো দেকোদের মত 'তুমি' কেন বল গো? 'তুই' বলি। তা দেখ্ বোন, বল্ দেখি, আমি হই পুত থাকতে আপুতি, তুই পুতের মা, আমার নাই বলতে কেউ নাই, আমাকে তো দেখবি দুঃখে-সুখে?

মহনির পাকানো দেহ। শরীর এখনো খুব শক্ত। সে সইয়ের দিকে ঈষৎ হেসে চায়। দুজনে দুজনকে দেখে, গাছের দিকে চায়। তারপর এ-ওর মাথায় পরিয়ে দেয় শালপাতার কোরক। এখন বনে পাঁচ জাতি পড়োশি নাই। সই পাতালে জোহার করতে হয়। এ-

ওকে জোহার করে। তুই আমার শালপাতা, আমি তোর শালপাতা। তুই আমার ঘরে একদিন খাবি, আমি তোর ঘরে একদিন খাব। সই চলে যায় কাঠের বোঝা মাথায়। মহনি হাসিমুখে কাঠ কুড়াতে থাকে।

মহনি কোনো সাঁওতাল মেয়ের নাম হয় না। পাহাড়ের সানু-দেশের জঙ্গলে এসে কোনো মেয়ে কাঠ-কান্দা-লতা-মূল সন্ধান করে না। করবে কেন বা বল! যার কেউ নাই, তার সমাজ আছে। এ তো নয় দেকোদের সমাজ যে মহনি একা পড়েছে বলে তাকে ভাসিয়ে দেবে। দেকো সমাজে বড় ছিটা-ভিটা হয় গো মানুষ। মহনি জানে। খুব জানে সে দেকোদের সমাজ, তাতেই কপালে এত দুঃখ, সন্তানের পায়ে শিকল পড়ে বার বার। ভগনাডিহিতে তো সে এখন থাকে। অনেক আগে সে ছিল অনেক দূরে, নলপুরে।

সেখানে তার জন্ম দেকোদের ঘরে। কেমন করে? সে বড় লতায় পাতায় কাহিনী গো, বড় লহরে লহরে নদীর মত বহে চলা কাহিনী!

মহনি তখন মায়ের পেটের অন্ধকারে গুটিসুটি আছে। মহনির বাপ দেকো মনিবের কাছে বাঁধা ছিল বেগারিতে। মনিব বলত, এক আঁজলা টাকা দে, খালাস হয়ে যা।

বাপ একথা শুনে হাসত, কেননা 'খালাস হয়ে যা' বলে মনিব হাসত। মনিব জানত যে সে তামাশা করল। বাপ জানত যে মনিব তামাশা করছে। বাপের মত, মহনির বাপের মত কে আর জানত বলো যে এক আঁজলা টাকাও মহনির বাপ দেবে না আর খালাসও হবে না সে। তাই তো সে রাতে বসে একটু একটু হাঁড়িয়া খেত আর ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ত। আর মাথা ঝেঁকে হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে বলত, না না, এক আঁজলা টাকাও দিব না, খালাসও হব না। সে তুই যাই বলিস। বউ বলত, কাকে বল?

—তোর পেটে যেটা আছে তাকে বলি।

—সে শুনছে?

—না শুনবে তো হবে কেন? সে তো কেবল বলে যে, বাপ্‌ তুই এক আঁজলা টাকা দে, খালাস হয়ে যা। নয় তো আমি জনম নিব নাই। মায়ের পেটে রব।

—বুঝলাম, শোও দেখি!

—শোব? তবে শুই।

—ছেলে হোক, মেয়ে হোক, জন্মিলে খরচ আছে। কি করে কি হবে জানি না।

—ভাবিস কেন? আমি ভাবি না। ভাবব কেন? এক আঁজলা টাকা দিতাম, খালাস নিতাম, তবে ভাবতাম। এখন ভাবব কেন? ঘুমা ঘুমা। সকালে কাজ আছে। তবে হ্যাঁ, ছেলেটা না মেয়েটা বলে, টাকা দিয়ে খালাস নিয়া কর বাবা। নইলে জনম নিব নাই। দেকো মনিবের বান্ধা বেগারের জন্মিতে জন্ম নিলে আমিও হব বান্ধা বেগার।

সে গ্রামে মনিব একা হয় দেকো। সকলে হয় সন্তাল হড়। মানব বাপকে বান্ধা বেগার করে, কিন্তু মনিব্যানকে বলে, পেট ভরে খেতে দিবে গো ওদের। গ্রামে জাতিজ্ঞাতি বলতে নাই, সকলই ওর। তেল তামাক দিবে, পেটের ভাত দুটো মানুষ পুষি, দশজনার কাজ পাই।

এমন মনিবের ধানবোঝাই গাড়ি মাঠ হতে ঘরে আসে। আর ধানের বোঝা টানতে বিকল হয় বলদ। মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। বলদের শোকে মানব মাথা চাপড়ায়। একমুঠি টাকায় কেনা বলদ গো! কেমন বাঁকা শিং, কেমন নধর শরীর। হা দেখ কেন তোমরা, এক আঁজলা টাকা দিব, গাড়ির জোল কাঁধে ঠেলে কেউ দাঁড় করাও কেন গাড়িটা? তুল তুল, গাড় ঠেলে তুল। এক আঁজলা টাকা দিব। এই টাকা আমার কোমরে গেঁজে বাঁধা, এই টাকা জোড়া আঁজলা ভরে দিব।

এক আঁজলা টাকা দিবি?

কে তুই? বান্ধা বেগার?

হাঁ বাবু. টাকা দিবি?

দিব রে দিব।

মহনির বাপ তখন দুই চক্ষু রাঙা করে, ধুলা নিয়ে হাতে ঘষে ও বলে, টাকা দিবে, আমি খালাস হব?

নিশ্চয় খালাস হবি।

পাঁচজন বলে, এ কি কথা রে ছটরায়? ওই গাড়ি উঠালে কলিজা ফাটবে, মরে যাবি তুই। তোর বউয়ের পেটে সন্তান. এ কি করিস?

মহনির বাপ বলে, সন্তানটার লেগেই তো এ কাজ করি। সে আমাকে ব.ল, বান্ধাবেগারি হতে খালাস হই যা বাপ। নঁয়তো আমি জন্ম লিব নাই। বান্ধাবেগারের জন্মেতে সন্তান জন্মালে সেও হয় বান্ধাবেগার।

পাঁচজন বলে, আজ তু বান্ধাবেগার, কাল আমরা হতে পারি। দেকো যখন হতে আসে তখন হতে নানা ফান্দে ফেলে আমাদের বান্ধাবেগার করে। হাঁ হাঁ ছটরায়, বেগার জীবনে কষ্ট খুব, কিন্তু তু শালো মরে যাস যদি, তাতে আমাদের একটা মানুষ চলে যাবে, নয়?

মরলে মরব। লাগড়ে, ঝিকা, বাহা, করম কোন নাচ নাচব নাই আর, হাঁড়িয়া ভি খাব নাই। কিন্তু মরব কেন? আমি মরব? দুঃশালো। সেন্দ্রে রেয়ানে, শিকার পরবে গ্রামে শাল গাছের ডাল লয়ে আমিই যাব, দেখিস? লেঃ, চক্ষু ফেড়ে দেখে লে সব।

মহনির বাপ ধান বোঝাই গাড়ির জোয়ালে কাঁধ দেয়, ঠেলে উঠায়। পাকা ধান তার কালো অঙ্গে সোনার ঝারা দিয়ে মাটিতে পড়ে। হেই দেখ ও কাঁধ দিল। হেই দেখ ও উঠায়। জয়ার জয়ার মারাংবুরু! জাহের বুড়ি জয়ার জয়ার। ছটরায় দেখ আশ্চর্য কাজ করে।

ঘন ঘন জয়ার ওঠে। মেয়েরা বউরা ছুটে আসে। মহনির মা

খড়ের দড়ি বাঁধে আর মনিব্যানকে বলে, এমন ঘন ঘন জয়ার কেন শুনি রে আজ? কিসের আনন্দে জয়ার দেয় গ্রামের পাঁচজনা?

কে জানে মেঝ্যান বোন?

মহনির মা কুলকুল ক'রে হাসে। বলে, নির্ঘাত কেউ শুওর মারল। শিকার আনছে তাতে জয়ার দেয়।

মহনির মায়ের মনে কোনো কুডাক ডাকে না। সে বুঝে না যে যার জন্য তার হাতে লোহা, সিঁথায় সিঁদুর উঠেছিল, সেইজন তার পূর্বপুরুষদের কাছে যায় এখন! সে খড়ের দড়ি পাক দেয় আর সাপের কুণ্ডলীর মত থরে থরে কুণ্ডলী পাকে রাখে।

মহনির বাপ ধানবোঝাই গাড়ির জোল কাঁধে ঠেলে অসীম শক্তিতে উঠায়, উঠাতে থাকে। জয়ার দিতে দিতে মানুষ সহসা থমকায়। জোল কাঁধে মহনির বাপ থরথর ক'রে কাঁপে। পাঁচজন দৌড়ায়, তারাও কাঁধ দিবে। আর পাঁচজন বলদটিকে টানতে থাকে। তারপর মহনির বাপ সহসা কি বলতে যায়, বলতে পারে না। বগ বগ বগ শব্দে যেমন ক'রে বাঁধের মাটি ফেটে জল বেরোয়, তেমন শব্দে তার মুখ হতে সফেন রক্ত বেরিয়ে আসে। ধানমাথা কালো অঙ্গ রক্তে ভেসে যায়। রক্ত দেখে মহনির বাপের চক্ষু ঘুরে যায় উপরে-নিচে। তারপর সে মাটিতে পড়ে, যেন সতেজ শালগাছ কুঠারের ঘায়ে মাটিতে পড়ে, যেন কুঁচলা বাণ খেয়ে কালো বাঘ মাটিতে পড়ে। ভীষণ কোনো আক্ষেপে কি যেন ছিঁড়তে থাকে সে বাতাস থামচে। বুঝি বান্ধাবেগারি হতে বাঁধন ছিঁড়ে খুঁড়ে সে বেরোয়। তারপর সে মাটিতে মাটি হয়। আর পাঁচজন এখন শতজন হয়। তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকারে আকাশ ফেড়ে যায়। দেকোবাবু তুমার বলদের লেগে ছটরায়রে মেরে দিল!

ধানের গাড়িতে মহনের বাপ চাপে। জীবনে চাপে নাই। সন্থাল শত ঘর, দেকো তুমি একা!

ভাবি নাই মরে যাবে।

মাঝির বিচারে বিচার হবে।

যা বলিস।

কি বলব? এমন ঘটনা হয় নাই আগে। মাঝি পারানিককে সয়ে সামলে দিবে. তেমন ঘটনা নয়। ছেলেমেয়ের ঘটনা নয়, যে জগমাঝি সামলাবে।

যা বলিস তোরা।

তুমি হতে এমন ঘটনা!

যা বলিস

আমার বিচার বলে. তুমি চলে যাও. হেথা কোনো সন্তাল তোমার কাছে যাবে নাই. আর তারে আসতে দিবে নাই। মানে মানে চলি যাও. নয় মাথা রেখে যাও. জমি তুমি আমার কাছে বন্দোবস্তে নিয়েছ, কোনো রাজা-জমিদারের জমি নয়। তুমি এলে যখন, তখন কথা ছিল মিঠা মিঠা। এখন তুমি নিজেরটা লয়ে হাটে বেচ, আমাদেরটা এক পুইসায় কিন, চার পুইসায় বেচ হাটে লয়ে। তাতে আমরা ভি ঠকি নিয়ত। তুমি যাও। বান্ধাবেগার কর তুমি, ছটরায় মরে গেল।

মনিব ভয় পায়. থরথর কাঁপে। বলে, এখন দেশে সাহেব লোক আসছে, বিচার কানুন আছে। জমা নিয়া জমি ছেড়ে যায় কেউ? তোরা ধর্ম পথে চলিস. বিচার কর।

মাঝি বলে, তোমার কাঁধে মাথা রেখেছি বলে বড় বড় কথা বল, হাঁ? টাঙ্গি উঠবে নামবে, মনিবান কেঁদে কুল পাবে না। তাই চাও?

কালো কালো মানুষগুলি পাথরপারা চোখে চায়। ঐ লোকটার সঙ্গে এত কথা কিসের? এ তো ছিল নাই এখানে, আজ সন্তাল জনপদে ঢুকে গিছে, শিকড় ভি গেড়ে বসেছে। চাষে বাসে থাক কেন, লোভ করবে নাই, পেটে খাবে, খানিক বা বেচবে, কিন্তুক কিছু মানলে নাই, জমিন বাড়ায়ে লিছ, কেমন বন্দোবস্তে আমাদের খাটাতেছ। ভাদ্র মাসে দুঃখ থাকে চিরকাল। তা ছটরায়ের ঘাড়ে চাপি বসি করজ না দিলে কেন, তারে বুড়া আঙুলটা বা কালি মাখায়ে চেপে

করলে কেন ভূষা কাগজে, আর বান্ধাবেগার বা করলে কেন? না না ভাল বুঝি না আমরা। বুকের ভিতরটা পাথরপারা ভারি হয়ে যেতেছে আমাদের, হা দেখ পাথরটা তাতি উঠে যেমন, ছটরায়ের রক্ত সকলের গায়ে ছিটাছল তখন, সে রক্ত এখন আগুনছেঁকা দেয়। আর কথা কেন এত। কথা বারায় মুখ হতে, মুখ থাকে মাথায়, মাথা থাকে ঘাড়ে, মাথাটা নামায়ে দিলে তো সব আপদ মিটে।

এ সব কথা দেকো মনিব সন্তালদের চোখের দিকে চেয়ে পড়তে পেরেছিল। তার বুকের মধ্যে ধকড় ধকড় করতে লেগেছিল। বলি-দানের ভয়ে ভীত মুরগি যেন ঝাপটে বেড়াচ্ছিল বুকের মধ্যে। সে মাথা নামিয়ে বলেছিল, তোরা যা বলবি তাই হবে। তবে বলদটা মরে গিছে, পাপ হল বিস্তর। প্রায়শ্চিত্ত না করলে মরে যাব।

বলদ মরল তো প্রায়শ্চিত্ত আছে?

আছে বই কি।

ছটরায় মরল যে?

তার বউকে এক আঁজলা টাকা দিব।

মাঝি চোখ মেলে নিশ্চল দৃষ্টিতে মনিবকে দেখে। তারপর বলে, যা, গাড়ি জুড়ে নে। তোর বলদ নে, ধান নে, সকল তৈজস নে, চলে যা। ঘরটা তোর জ্বালাই দিব।

এ ভাবে সন্তাল সমাজের সিদ্ধান্তে দেকো মনিব গ্রাম ছেড়ে চলে যায় হেমন্তের শিশিরভেজা পাকা ধানের গন্ধ পিছনে ফেলে। মহনির মা অনেক দিন পাথর প্রতিমার মত বসে থাকে নিশ্চল। ক্রমে কাজ-কর্মে হাত দেয়। ছাগল গরু সামলাও, শাক-সবজি আজোও, যে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নাই। বুড়া লোকরা বলে দিয়েছে, পথেঘাটে কেঁদ না, সে জন পরলোকে কষ্ট পাবে। তাতে মা কাঁদে না। শুধু ভাবে, জয়ার জয়ার শুনতে ছিলাম, কে জানে যে আমার কপালে সর্বনাশ হতে লেগেছে? মনিগ্যানের কথা মনে হয় তার। তারও পেটে সন্তান ছিল। কোন বা দেশে গিয়ে সে ছেলে বিয়াবে?

এমন সব কথা ভাবতে ভাবতে সে চৈত্রের খরতাপে মহনি নদীর কূলে যেয়ে দহে স্নান করে আর কেমন বা কথা! যেমন ব্যথা, তেমন প্রসব। গ্রামে খবর দেয় মেয়েরা, সবাই তাকে বয়ে আনে ঘরে। দলমলে মেয়ে, কালো চুলে মাথা ঢাকা। চাতিয়ারে নাম হয় শুকুমার নামে শুকুমণি। কিন্তু মা বলে ম-হ-নি। সেই নামই থেকে যায়। সবাই বলে, মহ'ন! তোর কপালের বান্ধাবেগারি ঘুচাতে তোর বাপ অমন ক'রে মরেছে।

মহনি কিছুই বোঝে না এত কথার। তার বাপ আর মায়ের মনিব বাড়ি এখন বিজুবন। বাপ যেখানে মরেছিল, সেখানে ঝাটি-জঙ্গল। মহ'নরা সেখানে সিঁয়াকুল তোলে, বুনো জাম কুড়ায়। বাপ মরা থেকে মা এক খণ্ড জমিতে শাকসবজী আজ্জায়, মাঝির ব্যবস্থা। মহনি মার সঙ্গে হাটে যায়। হাটে যেতে আসতেই ভোমরের সঙ্গে দেখা। ভোমরের মাথায় কাঠের বোঝা, মহনির মাথায় সর্ষের ডালা কয়েক হাটবার কাটতেই ভোমর বলেছিল, একটা কথা।

কি কথা?

কথাটা দিয়ে তবে যাবি।

কি কথা তোর?

ত্রিগুর বলঃক রেয়ান্ না ইপুতুং রেয়ান?

তার মানে?

তুই নিজে আসবি আমার ঘরে, না জোর করে সিঁদুর দেব?

সেই কথাটা বলে যা।

মহনি হেসে বাঁচে না। নিজে যাব তোর ঘরে? ইপুতুং রেয়ান করবি নইলে? জোর করে সিঁদুর দিলে আমার গ্রাম হতে পুরুষরা যেয়ে তোরে ঠেঙাবে।

ঠেঙাক। তোরে যদি না পাই তো মার খেয়ে মরে যাব।

হায় রে ষোল বছরের যৌবন! হায় রে ভোমরের ঝলমলে হাসি মহনি বলল, তোর কে আছে জানি না।

আমার মা আছে।

বাপ নাই ?

না।

আমার [illegible] মা আছে।

রায়বারিচ্ (ঘটক) ধর্ কারে।

রায়বারিচ এসেছিল মহনির মার কাছে। আমাদের তো ছেলে আছে। বল, তোমার ঘরে আসার পথ কি খোলা আছে? আমরা তো জানি পথ খোলা আছে।

আছে গো আছে।

তারপর গ্রামের জগমাঝির বাড়িতে ওরা মেয়ে দেখতে এসেছিল। আসার কালে পথে ছিল বাঘের থাবার ছাপ, জল আনছিল মেয়েরা, সবই সুলক্ষণ। জগমাঝি বলল, মেয়েরা বাইরে এস গো। ভিন্ন গ্রামের কুটুম্বরা এসেছেন, জল দিয়ে যাও। জল নিয়ে আসার এক নিয়ম আছে। সবাই জানে, যে মেয়েটিকে দেখতে এসেছে, সে মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে তিনটি মেয়ে জল নিয়ে আসবে। দেখ, ভাল ক'রে দেখ গো। এমন করেই সারসাগুন হল, এই শুভাশুভ বিচারে দেখাদেখি। মহনির মায়ের যেহেতু কেউ ছিল না, সেহেতু সবাই ছিল। সমস্ত গ্রামসমাজ এসে দাঁড়ায় ও মাথা দেয়। মাঝি, পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক, যার যা করবার তার চেয়েও বেশি করে। কেন করবে না বল? ছটরায়ের মৃত্যু তাদের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। এমন এক মানুষ ছিল ছটরায়, যে কারণে দেশ হতে দেকো বিতাড়িত হল। দেখ! বড় যত্নে ধান চাষ কর, কিন্তু যদি বিষওকড়ার একটি বীজ পাখির মুখ হতে পড়ে, যদি বাতাসে উড়ে আসে, যদি তোমার নজর এড়ায়, তাহলে দেখবে বিষওকড়ায় ধানক্ষেত ভরে গেছে। যত উপাড়িবে, তত তার বীজ ছিটবে আর আরো আরো বিষওকড়া জন্ম নিবে।

বিষওকড়া একটি দেখলে উপাড়ে ফেলবে।

এক দেকোকে যদি সন্তাল জনপদে বসত করাও তাহলে দেখবে দেকোরাই আছে, সন্তাল নাই। ভাগলপুরের বীর সন্তাল বাবা তিলক মাঝির নাম জান না তোমরা? সেজনা এক হাতে ইংরাজ, আর হাতে দেকো, দুই বিষওকড়া উপাড়িতে কত রণ করল। জান নাই তার গান?

মহনি ও ভোমরের বিয়ে হয়। হায় গো, হায় হায়! মহনিরা জানে নাই যে ইংরাজ সরকার কুলা ঝেড়ে ঝেড়ে সন্তাল পরগনায় কেমন করে বাঙালী, ভাটিয়া, বিহারী, মাড়োয়ারি নানা জাতির বিষওকড়া রোহিন্ করে। কিছু জানে নাই। মহনি ভোমরের মায়ের কাছে তেল-হলুদ-সিঁদুর নিল, তাকে দিল। কত আনন্দে মাঝির সামনে স্বীকার গেল, এ জন আমার ধর্মের স্বামী হয় গো বাবা। এ জন খেটে পিটে ঘরে এলে জল, দাঁতন দিব। শ্বশুরঘরের সকলকে জল দিব, সেবা করব। এ কথা বলার কালে মহনি হয় ফুলে ফুলে ঝলমলে পলাশ গাছের ডাল। সুখের ভারে ভেঙে পড়ে, ভালবাসায় উছলায় মহনি নদীর মতন।

বড় সুখ, বড় ভালবাসা। ভোমর একটি ফল তুললে তাকে আধখানা দেয়। প্রথম সন্তান মেয়ে। ঠাকুমার নামে নাম সোমনি। মহনি বলে, সবাই "সোমনি" বলে ডাকবে গো। আমাকে কেউ "মহনি" বিনা আন নামে ডাকে নাই। তাতে শুকুমণি নাম মুছে গেল।

সোমনির পর কি কাণ্ড বল! ছয়টি বছর মহনির কোল খালি থাকে। কত কি যে ঘটে সন্তাল গ্রামগুলির জীবনে। বারহেটে রাত্রিবাস করতে নাই। সেখানে থাকে দেকো জন। তারা নির্ঘাত তোমাকে ভুলাবে, মদ খাওয়াবে, জমি নিয়ে নিবে। তুমি তো মদের ঘোরে কাগজে টিপ দিয়ে বসে আছ। এমন কথা বুড়া লোকরা বলে গিয়েছে। বুড়া লোকরা বুড়া হাড়ে অনেক জ্ঞান রাখে। সে কথা ভুলে যাচ্ছিল সন্তালরা। গ্রামের হাটে কি অমন জমজমাট আছে?

বারহেট এখন সন্তাল পরগনার মাথার মুকুট। কত দোকানপাট, হাটের দিনে ভালুক নাচ, বাঁদর নাচ, সাপের খেলা। বিদেশী জাদুকর তোমাকে অবাক করে দেবে। এই আমের আঁটিতে গাছ হল, ডালে ডালে পাতা, আম ঝুলে আছে। সন্তালের মন ভুলাতে কাঁচের চুড়ি, গালার রঙিন কাঁকই. আয়না, পুঁতি ও পিতলের মালা, ঝকঝকে ছুরি, গলায় পরার জন্য সুতোয় গাঁথা পিতল ও দস্তার নকল মোহর।

এত সবের ছলনায় ভুলে প্রতিবার শস্য বেচা পয়সায় অনেক মন-ভুলানো নকল জিনিস কিনে কিনে ফতুর হয়েছিল অনেকের সঙ্গে ভোমরও। কিন্তু খালি হাতে ঘরে ফিরবে? যার কাছে চুড়ি বালা কেনে সে বলেছিল, আমরা সবাই মনিবের লোক হই। তোরা দেখিস নানা নিধি বেসাতি, কিন্তুক তিরপুরি সাহাবাবু, যার আড়ত দেখিস. তিনি আমারদের মনিব হয়। তিনি ধার দিবে এখান। কিন্তু বাপা! ভাল কথা যদি শুন তবে পলাও। ধার নিবে কি সাপের ছোবল খাবে। এমন কোনো ওঝা শুনিন নাই যে এ সাপের গরল নামাতে পারে। তাই বাপা! ধার নিও না। আর তোরা জঙ্গলিয়া সাদাসিধা মানুষ। আমার কাজ, আমি লোভাব তোদেরে। তোরা চক্ষু বুজে গাঁটের কড়ি বেন্ধে নিয়ে ঘরে কেন পলাস না?

এ কথা শুনে একজন নাটা মানুষ এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, তোরা বাবু সব পারিস। মনিবের জিনিস লয়ে দোকান করিস, আর সে লোক সন্তালদের টাকা দিবে বলে বসে আছে। এদের যেতে দিবি নাই? উয়াদের কথা শুনিস না গো সন্তালরা। টাকা লিবি তো লে কেন। মনিব আমার দয়ার সাগর।

তিরপুরি বাবুর গদিতে যেয়ে ভোমররা সবাই রূপার সিকিতে দুই টাকা ক'রে ধার নেয় আর ভুষা কাগজে টিপছাপ দেয়। সে টাকা দেখে মহনি কত আহ্লাদ করে। তখনি ভোমরকে ভাত দেয়, হাঁড়িয়া দেয়। বলে, মুরগি কিন, ছাগল কিন দেখি। সংসারটা বেঁধে তুলি।

ছয় বছর বাদে ছেলে জন্মাল। ধাই বুড়ি কাপড়, ধান, বালা

পেয়েছিল। দ্বিতীয় সন্তান যদি ছেলে হয়, তাহলে প্রথম নাপ্তা অনুষ্ঠানের পরই মায়ের বাপের নামে নাম হবে। এই ছেলের নাম হয় ছটরায়। নাম হয় সমাজের নিয়মে। কিন্তু মহনির বুক দুরুদুরু কাঁপে। শাশুড়ি বলে, মুখ কেন শুকনা রে মহনি?

মা! ছেলের নাম শুনে বুক কাঁপে।

কেন রে?

আমার বাপের নামে নাম।

তাতে কি?

বান্ধা বেগার ছিল সে।

বান্ধাবেগার সেই জন হয়, যে কি না দেকো লোকের কথায় ভুলে ভূষা কাগজে আঙুল ছাপ দেয়।

মা! এমন দেশ নাই যেথা দেকো নাই?

মহনি! সন্তাল নাই এমন দেশ থাকলে পারে। দেকো নাই এমন দেশ বুঝি নাই।

থাকলে সে দেশে যেতাম।

সে দেশ নাই। এ দেখ না কেন, কেমন বা বেবস্থা? আমরা জানতাম আমরা আমাদের মত আছি। কিন্তুক খাজনা বন্দোবস্তে আমরা নলপুরের জমিদারের প্রজা।

বড় চিন্তা লাগে।

মহনির শাশুড়ি সোদ মানুষ হয়। মাঝি তাকে ডেকে বলে, হাঁ রে ভোমরের মা! নাতি পেছিস, খুব তো ভাত-হাঁড়িয়া খাওয়াছিস দেশের লোককে। কিন্তুক ভোমর না কি হাটে যেয়ে তিরপুরি সাহাবাবুর কাছে সাদা কাগজে ছাপ দিয়ে টাকা নিচ্ছে? এমন কুকাজ আরো চার জন করেছে। তুই জানিস না?

মহনি এ কথায় বাতাসের ঘায়ে অশথ পাতার মত কাঁপে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কি হল, অ মহনি কি হল?

বারহেটে তিরপুরি সাহাবাবুর নাম করল যে! ও নাম আমি মায়ের মুখে কতবার শুনেছি যে। সেই তো আমার বাপকে দিয়ে আঙুল সহি করায়, বান্ধাবেগারিতে বান্ধে বাপকে। সেই তো গ্রাম ছেড়ে বারহেটে বসে আছে গো।

মাঝি বলে, নতুন ছেলের মা কাঁদতে নাই। আমি যাব, দেখব কি ব্যবস্থা করি।

খুব শাসন গর্জন করে মাঝি ভোমরদের। তোরা কি সেধে শিকল পায়ে পরবি? ধান উঠলে চল্ দেখি বারহেট! হিসাব শুনে ধানে করজ শোধ কর্। বাপু হে! তোদের কত বলছি যে ঘরের বউয়ের হাতে লোহার বালা, কাঠের কাঁকন ভাল। কানে শোলার গুঁজি, গলায় কুঁচের মালা ভাল। গাছে ফুলের অভাব নাই। চুলে ফুল গুঁজল তো আর কি চাই। তবে কেন দেকো জনের চোখ ভুলানো চুড়ি-বালা-মালার ফাঁদে বান্ধা পড়? এবার খালাস করাতে পারি তো আর কিনতে দিব নাই। হাটে যাও, মাল বেচ, চলে এস। টুডু লোকে লোহার জিনিস বানায়, লবণ মাটি হতে লবণ নিকুশে লাও কাপড়-গামছা বুনে নাও, কুলা-ঝুড়ি-টোকা তৈরি কর। দেকো লোকরা তৈয়ারি মাল রাখে কেন হাটে তা বুঝ না? সন্তাল হড় হপনরে অলস করি দিতে চায়। টাকা লাও কেন? বাপ্পে লোকেরা সমাজ বেন্ধে রাখার জন্য লেনদেন চালু করে নাই? সে নিয়মে শুওরের বদলে ছাগল, ছাগল বদলে কাড়া, কেন বাপা? সেটি ছাড়ছ কেন? ভোমররা পায়ে পড়ে যায় মাঝির। ও বাবা! এত কথা ভাবি নাই। চকচকা চাঁদের মতো রূপার টাকা দেখে ভুলে গেলাম আমরা। আঃ আঃ! সাদা কাগজে ছাপ দিলাম, মনে নেয় পায়ে শিকল জড়াই গিছে। আমারদের খালাস করি দাও গো!

কিন্তু খালাস তারা হতে পারে নাই। তিরপুরি সাহা ভোমরকে বলে, হাঁ হাঁ, তোর শ্বশুর আমার কাছে ছিল বটে! নিজের হেম্মত বুঝল না সে, ধানবোঝাই গাড়ি উঠাতে যেয়ে মরে গেল। আ হা হা!

বলদটার শোক আমি ভুলি নাই। তা তোদের জংলী জাতের জংলী বিচার! আমারে খেদায়ে দিল। বউয়ের পেটে ছেলে ছিল। এই সেই ছেলে মহন সাহা। তা বাছারা! তোরাদের সে টাকা তো অনেক হই গেল সুদে আসলে। এখন করজ তোদের ষোলো টাকা। কি করবি কর্?

ধান লাও কেন, অনেক টাকার ধান।

অনেক টাকা, কত টাকা?

কয়াল ওজন করল, তা দেখ্ তিন গাড়ি ধান। কোন্ না তিন-বিশ মণ হবে একেক গাড়িতে?

হাটের কয়ালের ওজন আমি নেই না। আমার কয়াল ওজন করুক।

তিরপুরির কয়াল ওজন করে, তিন গরুর গাড়ি টাইল করা ধান তো সাত মণের উপর উঠে না। মাঝি তিরপুরির দিকে চেয়ে থাকল। বলল, ধান উঠা ছেলেরা!

সে কি? ফিরত নিয়ে যাবি?

তবে কি রেখে যাব? ইয়ারা বিশ গাড়ি ধান আনলেও তোর কয়াল বলবে দশ মণ আনল। যেমন করজ তেমন থাকবে, পেটে শুকাবে মরবে নাকি? ধান লয়ে যাই। তুই যা পারিস কর্গা।

তিরপুরি বলে, করজ বাড়লে পরে জমিন্ চলে যাবে।

"যাবে" বলিস কেন? আমি তো দেখি "গিছে"।

ভোমর ঘরে ফেরার কালে বলে, নলপুরে যেয়ে খোঁজ নিব? আমরা তাদের পরজা হই। এ সাহা দেকো জমিন নিতে পারে?

ভীষণ ও অক্ষম রাগে গর্জে মাঝি বলে, সব পারে। নলপুরের গমস্তা আর এই সাহা দুজনে ভাব-ভালবাসা কত তা জানিস?

কি বন্দোবস্তে তিরপুর সাহা ভোমরদের গ্রামটি নলপুর কাছারি থেকে নিজের নামে জমা নেয় গমস্তার সাহায্যে তা সন্তালরা বোঝে না গো। শুধু তারা জানতে পারে যে নয়া মালিক হল তিরপুরি

বাবু। বাবু খাজনা বাড়ায়। বাবু ভোমরদের ক্ষেত-জমি নিয়ে নেয়। ভোমরের চক্ষের সামনে বান্ধাবেগারির শিকল নাচে। বান্ধাবেগারিকে সন্তালের বড় ভয়। এ ভয় সন্তালকে দিশাহারা করে। ভয়ে ভোমর অন্য মানুষ হয়ে যায়। শুধু বলে, এ দেশ ছাড়া আরো দেশ আছে।

ভয়ে ভীত সন্তাল দেখলে দেকো জন বুঝে যে এ এখন বাঘের শিকার। বারহেটে হাটবারে আড়কাঠি ফিরে। দূর দেশে চল্ কেন। সেথা কুলি কাজে খাটবি, ভাল ঘরে থাকবি ভাল খাবি, টাকা কামাবি। টাকা পেলে জমি ছাড়াতে কতক্ষণ? এখন নিজেরা যেয়ে দেখ্ কেন কেমন সুখ।

ভয়ে ভীতে ভোমর কেমন করে আড়কাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তা কেউ জানে না। মহনিকেও সে কিছু বলেনি। লাঙল-মাথাল-কোদাল-কাস্তে, চাষবাসের জিনিস দেখলে তার চোখ লাল হত। জমিন গেল তো এগুলো নিয়ে যেতে পারল না? মা বলত, মহনি বলত, জমি আবার কোথাও যেয়ে নিব। কিন্তু ভোমরের মন বুঝ মানত না। সে হাটে যেত অপরের মাল বহে নিয়ে। একদিন সে মায়ের আর মহনির জন্যে কাপড়, তামাক পাতা, ছেলেমেয়ের জন্য ছাতুর লাড়ু কিনে আনে। আড়কাঠি টাকা দিয়েছিল। তার পরদিন সে হাটে যায়, সেই তার শেষ যাওয়া। আর সে ফিরল না। মাঝি অনেক খোঁজ তালাস করে। কিন্তু সন্তালের পায়ের দাগ যখন দেখবে ঘষে ঘষে বাহির পানে গেছে তখন জানবে, সে লোক যেতে চায়নি কিন্তু বড় দুঃখে গেছে। আড়কাঠির ডাকে যখন সন্তাল চলে যায়, তার মনে বাজে ছেলেমেয়ের সন্তাপ, মনে ঘুরে দং নাচের গান,—

হায়রে! কাশ ফুল ফুটেছিল
মেয়ে জন্মেছিল
হায়রে! পলাশ ফুল ফুটেছিল
ছেলে জন্মেছিল॥

এই সন্তালের দুঃখে বনের পাখি কাঁদে, বাঘ মাথা নামিয়ে পথ

ছেড়ে দেয়, সাপ ফণা নামায়। সকালে দেখা যায় এর পায়ের দাগের পাশে ঘাস বনে দুধবরণ ঝিউলি ফুলগুলিও দুঃখে মাটি পানে ঝুঁকে আছে।

মহনি আর ভোমরের মা বোবা হয়ে গিয়েছিল। হারে ভোমর, হা রে ভোমর, বলে বুড়ি বড় সন্তাপে মরে। মহনিকে মাঝি বলে, মা আমার। চল ভগনাডিহি গ্রামে লয়ে যাই। গ্রাম মাঝি চুনার মুমু বড় ভাল লোক। চার ছেলে তার, সিদু-কানু-চাঁদ-ভৈরব। ভোমর গিছে আজ ছয় বছর যায়। মেয়ে বড় হল। মেয়েটির বিয়া করাতে পারবে, ভাল আশ্রয়ে থাকবে।

সে যদি ফিরে ?

তারে পাঠায়ে দিব। হা রে মহনি মা ! ভোমরের লেগে বেনাবউ পাখির মত ঝুরে ঝুরে তোর একি দশা হল। আর মা ! তিরপুরির ছেলে মহন এখন ঘরের দখল নিবে। আমি বলি, ভগনাডিহিই ভাল।

চুনার মুমু সব কথা শুনে। সিদু-কানুকে বলে, মহনি আমার বোন হল, সোমনি তোমাদের বোন, ছটরায় এক ভাই। ঘর বেন্ধে দাও, মেয়ে বিয়া করাও। মহনি ! দেহে শক্তি আছে, কুড়াল আছে ঘরে, বনে গাছ আছে। কাঠ আন, হাটে বিচ, কান্দামূল অঢেল। ধান ভান লোকের ঘরে, ছটরায় বড় হোক, জমিন্ নিবে খানিক। সন্তাল সমাজে মহনি ! অনাথ বলে কথা নাই।

সিদু-কানু নিমেষে ঘর বাঁধে। তাদের মা উনান পেতে দেয়। নতুন হাঁড়ি কলসি আনে। কত তাড়াতাড়ি মহনি ভগনাডিতে গ্রামের একজন হয়ে যায়। ফেলে-আসা গ্রামে সকালের রোদে মাথামাখি আমড়া গাছের পাতাগুলি, শীতের সন্ধ্যায় কুলকাঠের আংরার আগুন আঁচ, হেমন্তে নতুন চালের ভাত উথলানো গন্ধ, সব তাকে রাত-দিন ভোমরের কথা শুধাত। মহনি কেমন ক'রে ভোমরের কথা বলবে বলো গো মানুষজন। কোন্ বা দেশে গেল, বুঝি নতুন সংসার করল,

বুঝি বহু দূরের পথ চিনে ঘর আসতে পারল না, মহনি কি জানে? দিদি গো! ধান ঝেড়ে দিই কুলায়। চরখিতে তুলার বীজ ছাড়াব? তুলা ধুনি গো দিদি, কাঠিতে তুলা পাঁজ করে রাখি, চরখায় সুতা কাটি, বেওনাতে সুতা রাখি গো। হ্যাঁ গো দিদি সব কাজ জানি। আমি না করলে সোমনি শিখবে কেন? শাশুড়ি বলে গিছে, মহনি! মা! হাত যেন থেমে থাকে না। তোমার ছেলেরা কাপড় বুনবে তো?

চার ছেলে মাঝির, কিন্তু সিদু-কানুর মত কেও নয়। ভগনাডি হতে কোনো কুমারী মেয়ে বারহেটের হাটে যাবে নাই। দেকো লোক চক্ষু ফেড়ে দেখে। হা দেখ, ভাদ্র মাস টানের মাস। ভাদ্র মাসে বারহেট হতে দেকো মহাজন চলে আসবে, বলবে ধান বাড়ি লাও, টাকা লাও, ভাবনা কর কেন? আমি কি নাই? তুমি কি একা? লাও হে, লাও হে!

বাস্, দেকো ঢুকালে জীবনে তো জীবন জ্বলি যাবে।

হাঁ হাঁ, তোমরা শুধাতে পার তবে কি করব? মরি যাব না খেয়ে? তা বলি না গো! চুনার মুর্মুর ছেলে আমরা, হাঁ, বাবা গ্রামমাঝি হয় বটে আর পুরানা নিয়মে বাবা মাঝির মান্যে আধা রেক জমি ভোগ করে। কিন্তুক আমরা তো আর আর জমি সবার মতোই হাসিল করেছি। ভাদ্র-কার্তিক টানের সময়ে ধান বাড়ি আমরা দিব, পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক দিবে। পেটে খেতে ধান, দেড়িয়া শোধ দিবে যে পারে। যে পারে না সে যা নিবে তা দিবে। যে তাও পারে না, দিও না। চাহিলে কয়দিন দেহে খেটে সাহায্য দিও। দেকো হাতে বান্ধা পড়ো না গো। দেকো এক মণ ধান দিলে দশ মণ নিবে। বলবে, সুদের লিয়মে লিছি বাপা। জংলী বুনা, হিসাবের বুঝিস কি?

এ ভাবে চুনার মাঝির চার ছেলে সবেরে ভরসা দিয়া রাখে। যেন বানের জল আটকায়। বারহেটের অদূরে গ্রাম ভগনাডিহি। তারা কি পারে দেকোর হাত আটকাতে? বেনো জল ঢুকে যায়। আর হুড়হুড়িয়ে বেরোবার কালে সন্তাল জনের ধান-চাল-সর্ষে নেয়,

জমি নেয়, মানুষ নেয়। ভাদ্রের ক্ষুধা আর কার্তিকা টান এড়াতে কতটি মানুষ তাদের বান্ধা বেগার হয় গো! এমন বেনো জল মহনির ঘরেও ঢুকে যায় গো। সে দুঃখের কথা বলতে গেলে পাথর দুঃখে ফাটে, নদীর জল শুকায়, গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাকা ধানে চিটা লাগে। জগ মাঝির চেষ্টায় আর সিদু-কানুদের চার ভাইয়ের পরিশ্রমে সোমনির বিয়ে হল। ছেলে ভাল। জমি জিরাত, হাল বলদ আছে। শাশুড়ি বড় দজ্জাল। তা অনাথার মেয়ের কপালে কি সর্বসুখ জুটে গো? মহনি তো মায়ের অধিক শাশুড়ি পেয়েছিল। কোন্ সুখ তার কপালে হল? কেন্দ না মা সোমনি। কোকিল কালো, মোষের মত জোয়ান বর পেয়েছ। কপালে থাকে চিটা ধান পোয়াতি ধান হবে। তুমি তো মা! বুঝদার মেয়ে হও আমার। মাকে ছাড়তে, ভাইকে ছাড়তে কেন্দে মর কেন? হেসে হেসে যাও। তোমার ঘর-বর-কুটুম হল, আমি বুকে জোর পেলাম।

তিন টাকা কন্যাপণ নিয়েছিল মহনি। বর পক্ষকে তাই কিছুই ফেরত দিতে হয়নি। ছাগল কিনেছিল গ্রামে। ছটরায় বড় দুরন্ত ছিল। দিদির বিয়ে হতে সে হয় শান্ত, বুঝদার ছেলে। ছাগল পালে মা, সে বেচে ছাগলবিয়ানো ছানাগুলি বড় করে। গ্রামের ছেলে-দের সঙ্গে গরু চরায় পাঁচজনের। তীর ধনুক, গুলতি বাঁটুল তার সাথের সাথী নাচে গানে সে সবার আগে থাকে। ষোল বছরে পড়তে ছটরায় দলমলে শালগাছ যেমন। হাটে যায় আগে আগে। এমন ছটরায়ের উপর মহন সাহার নজর পড়েছিল। আর! সিদু-কানুরা গ্রামে নাই যে ভাদ্রে, যে ভাদ্র এল প্রচণ্ড খরায় শস্যক্ষেত্র জ্বলে যাবার পর. অনাহারের হাহাকারে, সেই ভাদ্রে মহনির ছেলে ক্ষুধার তাড়সে আর কত জনের সঙ্গে ধান বাড়ি নিল মহনের ঠেঙে।

ছটরায় শুধু একই কথা বলত, কেন, কান্দামূল খুঁজে মরব কেন? কে বলে ধান নাই। দেখ্ যেয়ে মহন সাহার গোলায় কত ধান। ধান নাই কে বলে?

সে হয় মহাজনের ধান।

ধান তো!

সে ধান বাড়ি নিলে বান্ধাবেগার করবে!

ইস্! অতই সোজা!

মহনকে তুই জানিস না ছটরায়। আমি মায়ের পেটে, সে মায়ের পেটে। তার বাপের কাছে আমার বাপ বান্ধাবেগার। বান্ধা-বেগারি হতে খালাস হবার তাড়সে অসম্ভব কাজ করতে যেয়ে, আমার বাপ মরে। সেই কারণে সমাজ মহনের বাপকে গ্রাম হতে তাড়ায়।

তাতে কি? সে তো হই গিছে।

হই গিছে? হই যায় কখনো? মহনের বাপ, মহন সে কথা ভুলে না। তাতে তোর বাপরে দেশছাড়া করল। গ্রামছাড়া করছিল আমারে যার কারণে, সেই ছটরায়ের বংশ উখাড়ে দিব। শত ছেলে ধানবাড়ি নিক, তোরে বান্ধা বেগার করবে।

মা! তার ঘরে এত ধান, ধানের টাইল।

এত ধান থাকতে উপাসে মরব?

মাঝি তো ধান দিছে।

যতদিন ছিল ততদিন দিছে।

না থাকলে দিবে কেমনে?

আমি ভাত খাব। অত কথা জানি না।

সিহু-কানু আসুক। কোনো দিশা করবে।

খিদার জ্বালা বড় জ্বালা হয়। ভাল মানুষ পাগল হয়, শান্ত ছেলে হয় হঠকারী। ছটরায় তাই বারহেটে মহন সাহাকে বলে, ধান বাড়ি দে বাবু। চাষ উঠলে শোধ দিব।

মহন সাহা হাতে পায় চাঁদ। বারহেটে ১৮৫০ সালে গাদ জাগিয়ে বসে থাকার ফলে আজ সে মস্ত পুরস্কার পাচ্ছে। এই ছট-রায়ের বাপকে দেশান্তরী করা গেছে তা যেমন সত্যি, সে জনকে বান্ধাবেগার করা যায় নি তাও তেমনই সত্যি। আরেক ছটরায়ের

কারণে সন্তালরা মহনের বাপকে গ্রাম হতে বের করে দেয়। সে রাগ, সে অপমান বুকে নিয়ে মহনের বাপ তিরপুরি মরে গেছে। একে বান্ধাবেগার করতে পারলে মহন পায়ে শিকল দেবে।

ধান দিবি না বাবু?

কেমনে শোধ দিবি?

তুমি বল।

কি দেখে ধান দিব?

তুমি বল।

জমি আছে? না না, মহনির বেটা তুই, জমিন্ পাবি কোথা? জমি যে নাই তা মুখ দেখে বুঝেছি।

বাবু! সিহু মুর্মু জমিন দিবে এবার। খিলখুঁট দেখাই দিবে, জমিন হাসিল করি নিব। এতদিন জোয়ান হই নাই, দেয় নাই।

সে জমিন্ আসমানে।

তবে দিবি না?

গায়ে খেটে শোধ দিবি?

তা দিব।

মহন শীতল ও নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকে। এক গ্রাম সন্তাল ছিল, সকলের জমি ছিল, জমিতে ধান হত। ছটরায় মরে গেল বলে তিরপুরির বিতাড়ন। সব জমি, সব ধান না নিতে, সব সন্তালকে কামিয়া, বান্ধাবেগার না বানাতে তিরপুরিকে চলে আসতে হয়। এ কি কম আফসোস? এখন একে বান্ধাবেগার বানাতে পারলে সে জ্বালা খানিক মিটে। সে গ্রাম মহন জানে না, সে সময়ে সে মায়ের পেটে। কিন্তু সে জ্বালা, সে আফসোস, তিরিপুরি তার রক্তে রোহিন করে গেছে।

"সিহু মুর্মু জমিন দিবে এবার!" ভগনাডির মাঝির ছেলে সিহু মুর্মু, কানু মুর্মু যেন বিষখোপরা। সাঁওতালদের উপর দিকু কি অবিচার করল তা দেখতে ধেয়ে আসে। এই বারহেটের হাটে তারা

সাঁওতালদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। কথায় কথায় বলে, দেখ্ দেকো! ধান বাড়ি দিস যখন, তখন এই ডোল ভরে দিয়ে বলিস এক মণ হল। নিবার কালে দশ ডোল দিলেও বলিস এক মণ হল নাই। এ কেমন হিসাব?

যে সন্তাল বলে, কথা বলিস না সিদু!

তাকে গাল পাড়ে কত! বলে বনে যেয়ে কাঁড় তুলে বাঘ মারতে পার আর দেকোরে মারতে পার না? তোদের বাঁচায় এমন সাধ্য কারো নাই।

বহোত বিষখোপরা ওরা। মহনকে বলে, তোরা বেইমান, সাহেবগুলো বেইমান, তোদের জমিদার, পুলিস, সব বেইমান।

মহনকে বলে, ধান নিবি?

নিব।

তবে টিপছাপ দে। যতদিন না ধানের করজ শোধ হয়, তত-দিন আমার জমিনে খাটবি।

ছটরায় টিপছাপ দিয়েছিল। দুই ডোল ধান দিছিস বাবু, ইয়ার দাম চার টাকাই হবে? চারমাসে তুলে দিব।

হাটুরিয়াদের গাড়িতে ধান নিয়ে ছটরায় ঘরে ফেরে। আর সেই বর্ষার সন্ধ্যায় মহনির আর্ত বুকফাটা হা হা কান্না শুনে ছুটে আসে সিদু কানু। আজই তারা ফিরে এসেছে। কত দূরে গিয়েছিল তারা, কত কত গ্রাম ঘুরেছে, দেকো জনের জুলুমে উচ্ছেদ হওয়া কত সন্তালের বুকের কান্না তাদের বুকে জমা হয়েছে, সে সব কথা তারা খানিক বলছিল, আবার দূর দূর গ্রামের আত্মীয় স্বজনের কথাও বলছিল মা-বাবাকে। কান্না শুনে তারাও ছুটে আসে। একি ব্যাপার? কেউ কি মরে গেল? বাড়িতে মানুষ তো মহনি আর ছটরায়। কার কি হল?

বর্ষায় ছিপছিপা বৃষ্টিতে মহনির উঠানে মানুষ ভেঙে পড়ে। নিমেষে কত মানুষ গো! দেখ দেখ মহনি, এমন দুঃখেও তোমার

পাশে সমাজ আছে, সমাজ থাকে। সন্তাল সমাজে কে কারেও ফেলে না গো। সন্তালরা এ-ওকে দেখে, পাশে থাকে সেই হিহিড়িপিড়ি দ্বীপদেশের দিন হতে। বুড়ো লোকেরা বলে গিছেন, সন্তালরা যতদিন এ-ওরে দেখবে ততদিন তবু ভরসা। যেদিন সন্তালরা দেকোর মত হই যাবে, অর্থাৎ ধনী ধনীকে দেখবে, আর ধনী গরিবকে দেখবে না, যেদিন একের ঘরে তিন কুনকা চাল রান্না হবে আর অনেকে এক কুনকা চাল ভাগ করে নিয়ে খাবে, সেদিন জানবে সন্তাল সমাজে বড়ই দুদিন। তা এই বর্ষার সন্ধ্যায় মহনি তো ডুকারে কাঁদে ১৮৫০ সালে। সকল সন্তাল ছুটে আসে। সিদু-কানু বলে, বর্ষার আন্ধারে সাপ কাটল কি বা? চলো চলো দেখি।

না গো না! সাপ কাটে নাই কিন্তুক কেটেছে, বিষে অঙ্গ জ্বলে নাই কিন্তুক জ্বলেছে। এই বিষ নামায় কার সাধ্য আছে এমন? ভগনাডির মানুষজন দেখে, মহনির দাওয়াতে দুই ডোল সোনার ধান। উঠানের ধুলায় লুটাপুটি মহনি। সে সকলকে দেখে আরো জোরে কেঁদে ওঠে। হা রে সিদু কানু, তোরা এলি যদি তো কয়েক ঘণ্টাঘড়ি আগে কেন এলি না রে? ছটরায় আমার কথা মানল না, ক্ষুধার জ্বালা সইল না, বারহেটে যেয়ে মহন সাহার কাছে সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে এই ধান আনল রে! বান্ধাবেগার হতে স্বীকার হই এল।

সকলে এ কথায় বিমূঢ় হয়ে যায়, চোখে চোখে বর্ষামলিন অন্ধকার চিরে ছটরায়কে খোঁজে। ছটরায় উঠানের সজনা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে গাছটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। এমন অন্ধকারেও চোখে পড়ে তার চেহারা ও কান্তি দলমলে, ঝলমলে এখন বড় হবার মুখ।

ছটরায়। এদিকে আয়!

মহনি কান্নার বেগ কমায়, আস্তে আস্তে গলার স্বর নিচু করে। ভগনাডির চুনার মুর্মুর ছেলে সিদু মুর্মুর গলা হতে যখন এমন চাপা ও ক্রুদ্ধ ডাক বেরোয়, তখন ব্যাপার অতি গুরুতর। ছটরায় এগিয়ে

আসে। দু হাত ঝুলিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মারলে মারতে পারো, এমন তার ভঙ্গি।

সিদু বলে, এমন কাজ কেন করলি? ভাদ্র মাসে টান শুরু, কার্তিক অবধি চলে হাঁ। বর্ষায় দুঃখ থাকে, তায় খরার পর বর্ষা হলে দুঃখ বেশি, হাঁ। আমি তো সন্তাল, গ্রাম হতে গ্রাম দেখে এলাম, খরায় জ্বলে গিছে, বর্ষায় মরতেছে। জঙ্গলেও কান্দা মূল পাগার লাগি হাহাকার, সব মানি। কিন্তুক তুই যেয়ে বান্ধাবেগারির কাগজে টিপ দিলি কেন? বল্ মোরে!

খিদার জ্বালা সইত লারলাম।

খিদা তোর একার? মাঝি-পারানিক-জগমাঝি, যে যার ঘরের ধান লুটায়ে করজ দিল, তারাও ফিরে বনে জঙ্গলে তোদের মত।

খিদা সইতে লারলম যে!

সিদু মাথা নাড়ে আর মাথা নাড়ে। হা রে বালক! কি বুঝাব তোকে? তোদের বেলা মহন সাহার হিসাব হয় আলাদা। আর কারো বেলা সে গাই ছাগল জমিন্ ধান নিয়া ছাড়ি দিবে। তোরে বাঁধবে শিকলে। "ছটরায়" নাম তোর, তোর মাতামহের নামে নাম। মাতামহের কারণে মহনের বাপ গ্রাম ছাড়া হয়। সেই রাগ তিরপুরির ছিল, মহনের আছে। ছটরায়রে কিছু করতে পারে নাই, তোর উপর দিয়া শোধ উঠাবে। হা রে বালক! এ তুই কি করলি?

কানু মহনিকে সান্ত্বনা করে, দিদি! দাই! যা হয়েছে তা হয়েছে। ধান উঠাও, ছেলেকে খেতে দাও। কপাল মানি না, লিখন মানি না, তোমারে দেখে মানতে মন চায়। গ্রামে কিছুদিন নাই বলে এমন বিপদ হল। উঠ দিদি।

মহনি ওঠে, চুল বাঁধে। নিশ্বাস টেনে শক্ত হয়, নিজেকে বুঝায়। তারপর বলে, এই উঠলাম।

পরদিন হতে কেউ শিকারের মাংস, কে বনের কান্দামূল, যে যা পারে দিয়ে যায়। কতদিন আর ছটরায়কে রাখবে মহন সাহা? যে

কোন দিন তাকে নিয়ে যাবে। এবার ভাদ্রমাসে আমাদের অবস্থা ছিটাভিটা। মহনের তো আছে ক্ষেতজমিন। সে তো ভাদোই ধান কাটাবে, কুরথি বুনাবে। আশ্বিনে সরিষা বুনাবে। সাপ যেমন করে ইঁদুরের গর্তের দখল নেয়! নিজে গর্ত খুঁড়তে পারে না বলে! তেমন সুকৌশলে মহন সন্তালদের জমিন দখল নেয়! নিজে জমিন্ তৈরি করে না। এভাবে সে হেলাচেলা জমিন দখল করেছে। মহনি গো! মাছ ধরেছিল ছেলেরা, নে। তোরা মা-বেটা খা।

ছটরায় ভয়ে তিরিথিরি কাঁপে, ভাত খায়, মায়ের ছায়া হয়ে ঘুরে সঙ্গে সাথে। মহনি একবার বলে, বাপ পলাছিল, তুই পলাতে পারিস না? আবার বলে, না না, অদর্শন হোস না রে। সিদু কানু আছে, ঠিক কোন না কোন কৌশলে খালাস করি আনবে। আঃ! যদি ছটরায় নাম না দিতাম! কিন্তুক সমাজের নিয়ম, আমি করি কি? মহন সাহা কি ছাড়ি দিবে?

ছটরায় তিরিথিরি কাঁপে। ওই মহনের গ্রাম লালডি, এই ভগনাডি! মাঝে বহে গোমানি নদী। ভাদ্রমাসে গোমানি সগর্জনে বহে। মহনি ভাবে, মহন সাহা আসবে তো নিশ্চয়। গোমানির জল পেরাতে না পারলে তো আসবে না। জলে ভিজে ভিজে সে নদীপারে যায়। অ মাঝি। মহন সাহাকে তো চিন। সে জনা নদী পারাতে চাহিলে তারে যেন এনো না। মহন আমার ছটরায়রে ধরে বেন্ধে লালডি নিবে। জলে ভিজে ভিজে সে আসে। কিতা পাতার টপর গো, মহনির মাথে ছাতি গো, ভাদোরা জল টপর বেয়ে ঝরে।

কিতা পাতার টপরে ভাদোরা জল শুকায়। আশ্বিনে দেকোদের ঘরে বাজনা বাজে। ঠাকুর উঠবে, পূজা হবে, মহন সাহা ছটরায়কে নিয়ে যায়। গোমানির তীর হতে ঝপ করে ধরে, ছেঁচড়ে নিয়ে যায়। মহনির মাথায় ভগনাডির আকাশ ভেঙে পড়ে। ছটরায় রে! তার কান্নায় দলদলি পাহাড়ের পাথুরা বুক ফাটে।

সিদু বলেছিল, মানুষ লয়ে কামিয়া করি রাখবে, বান্ধাবেগার করব, এমন কোনো কানুন নাই।

কানু বলেছিল, মুখে বললে হবে?

চাঁদ বলেছিল, একা ছটরায়? গোটা সন্তাল সমাজেরে দেকোরা বান্ধাবেগার করি রাখছে, দেখ নাই?

ভৈরব বলেছিল, কানুনে কি আছে, উকিল মহুরি জানে। তারা আমাদের জানায় না।

সিদু বলেছিল, জানাতে চাহেনা বলে আমাদেরকে লেখাপড়া হতে বঞ্চিৎ করি রাখে।

কানু বলেছিল, দাদা! এই এতজন বান্ধাবেগার, এই দেকোরা জমিন কাড়ি নিবে, এই জমিদারে-সাহেবে বুড়ো বর-জোয়ান বউয়ের মত তোয়াজ খোশামোদ চলবে, এমন চলতে পারে?

এ কথার উত্তরে সিদু উঠে গিয়ে হিংস্র আক্রোশে ক্ষেত থেকে বিষওকড়া উপড়াতে থাকে। বলে, ধান গাছ মারি দিবি? মাটিতে বিষ ছাড়বি? শালো বিষওকড়া! তোদের :উখাইড়ব। উখাইড়ে নির্মূল করব তবে আমি ভগনাডির সিদু মুর্মু!

কানু ভাইদের বলে, আর বাস্তাম খায়না। চল্। দাদা ক্ষেপি গিছে। সে লাফ মেরে ক্ষেতে গিয়ে পড়ে ও বলতে থাকে, আজ সিদু-কানু তোদের উখড়ায়, কাল দেকো-জমিদার-মহাজন সাহেব, সকলরে উখাইড়বে?

সিদু বলে, হাঁ! মাটিরে কথাটা দিলি। মনে থাকে যেন, হাঁ! মনে থাকে যেন! একা ছটরায় নয়, হাজার ছটরায় আছে। একা মহনি কাঁদে না, হাজার মহনি কাঁদে। তাই দেখতেই গিছিলাম আর তাই দেখি আসছি। মনে থাকে যেন!

এর জবাবে কানু সগর্জনে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে ও ধারালো নিড়ানি ছোঁড়ে। দুটুকরো হয়ে ছিটকে যায় একটা সাপ। বলে, চাঁদ কি চক্ষু দুটা ঘরে রাখি আসছিস?

এবার সাপের উপদ্রবও বেড়েছে।

সিদু-কানু মনে রাগের পাহাড় জমা করতে থাকে, আর মহনি নিশ্চুপ হয়ে যেতে থাকে। সে শুধু কাঠ কুড়ায়, কাঠ বেচতে যায়। গোমানির ওপারে লালডি। কাঠ নিবে গো! না, পয়সা চাইনা! কড়ি-দামড়ি-লোহা ও তামার ঢেবুঁয়া, কোনো মুদ্রামূল্যে বেচব না কাঠ। লবণ দিতে পার। হাঁ গো, মহন সাহার খামার হয় কোথা? এ সকলই তার? এই সব?

খুঁজে খুঁজে সে যায় ছেলের কাছে। এখন চৈত্র মাস। এদের নাই গো কোনো পরবপালন। এরা, সন্তাল কামিয়ারা, বড় দুঃখে থাকে। ছটরায় এ ভরা যৌবনে কেমন স্থির লক্ষ্য পাগলপারা চোখ, বড় বড় চুল। সে এমন চৈত্রে লাঙ্গলের ইষ, গাড়ির জোয়াল বানায়। তার পায়ে থাকে সরু শিকল। শিকলের মাথা খুঁটায় বান্ধা। ছেলে মায়ের কাছে পালিয়ে গিয়েছিল, সে হতে শিকল। মহনি ছেলের কাছে বসে। তাকে গুড় পিঠা খাওয়ায়, জল এনে দেয়। ছেলে কথা বলে না, মা কথা বলে না। মহনি ছেলের পিঠে হাত বুলায়। ছটরায় কাজ করতে করতে বলে, তুই যা মা! মহনি নিশ্বাস ফেলে। ছটরায় বলে, দিদি ভাল আছে? মহনি অস্ফুটে বলে, হাঁ। ছটরায় বলে, তার গিদরাট'? মহনি বলে, ভাল আছে। ছটরায় বলে, তুই চলে যা মা। হাতে কাটারি রাখিস। মহনি বলে, রেখে'ছ। ছটরায় বলে, তেল আনিস টুকচা। গায়ে খড়ি উড়ে। মহনি বলে, আনব।

তারপর সে উঠে পড়ে ও ঘর পানে হাঁটতে থাকে। ছত্রিশ বছর বয়সেও তার শরীর টনকো, তাজা। একদিন মহন তার সামনে দাঁড়িয়েছিল এসে, তার শরীর দেখেছিল আধবোজা চোখে। কাজ করতে করতে ছটরায় তাকে দেখছিল, মহনিকে। তাতে মহন বিব্রত হয় নি। ছটরায় তার বান্ধাবেগার। বান্ধাবেগার মানুষ নয়। মহনি তার মা কি না, সে কথার কোন দামই নেই এখানে। মহনি একটি

মেয়ে যার স্বামী দেশান্তরী এবং যার শরীরটি যথেষ্ট মজবুত। ছটরায়ের চোখ ক্রমেই ধারালো হচ্ছিল। মহনি একটু কপাল কুঁচকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে মহনের দিকে। তারপর সে ভাবে চেয়ে থেকেই ধারাল কাটারি চেপে ধরে এক কোপে কয়েকটি তরুণ শিমুলচারার মাথা কেটে ফেলে ও ধীর পায়ে কাটারি চেপে ধরে চলে যায়। মহন শিউরে উঠেছিল আর তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

গ্রামে সিদু কানু ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৮৫০ থেকে তাদের ব্যস্ততার শুরু। এর মধ্যে বারহেটে হাটবারে একদিন মহনি কার কান্না শুনে ফিরে চায়। ভরত কিসকু, তার পুরানো গ্রামের লোক কাঁদছে। কেন কান্দ. ভরত তুমি কান্দ কেন? কে শুধায়? ছটরায়ের মা মহনি? না কেঁদে কি করব? হাসব? তিরপুরির ছেলে মহন আমার এক গাড়ি ধান-সর্ষা নেয়, তবুও বলে না এক মণ হল। আমি কি করব, কোথায় যাব? ধান কি সিজাব?

মহনি তার দিক থেকে মুখ ফিরায়। হনহন্ করে হাঁটে। চাঁদ মুমু হাটে আছে, তারে খুঁজে আনি। চাঁদ! এ মহন সাহা বুঝি ভরত কিস্কুরে এখনি বান্ধাবেগার করে। ঝাটাপাটা এস। মহনের কীর্তি জান না? সন্তাল যত দেয়, সে বলে না "এ বিশ সের হল" শুধু বলে, "দশ হল, পনেরো হল।" চাঁদ! "বাবু একবার বিশ বোল্" সন্তালের এ কান্না তুমি শুন নাই কখনো? যদি শুনে থাকো, তবে কি পার স্থির থাকতে?

মহনির ডাকে চাঁদ ঝাটাপাটা আসে, সঙ্গে থাকে শত সন্তাল যুবক। এক যুবককে চাঁদ সামনে রাখে। মহন সাহা! বাবু! এরে বুঝায়ে দাও দেখি। কি বল? এ কে? এ জনা ভরত কিসকুর আপনজন লাগে। এরে হিসাবটি বুঝাও দেখি। এ জানে লেখা পড়া অঙ্ক হিসাব। এরে বুঝাও তো। বাবু! ভরত কত মণ নিছিল? বি—শ সের? চার বিশা দুই মণ? এখানে কত আছে? তোমার হিসাবে পনেরো সের? ভাল রে ভাল। তা ভরতের হিসাবটা থাক কেন, আমি

পনেরো সের ধান কর্জ নিতে চাই। আমারে তো তুমি ভালই চিন,—ভগনাডিহি গ্রামের মাঝি চুনার মুর্মুর ছেলে আমি। এখন,—

শুন মহাজন।

যদি হও সদ্জন।

তবে পনেরো সের করজ নিব আর ভরত কিসকুর আনীত পনেরো সেরই নিব। ঝামালি তো নাই, মাপা তো আছে। উঠাই ধান, কি বল?

মহন প্রমাদ গণে। চাঁদ মজা পায় ও একটা গাড়ির উপর চড়ে দাঁড়ায়, হেঁকে বলে, সন্তালজন শুন হে! আমাদের পেটে টান ধরে তো বাবুর মনে দয়ার বান ডাকে। বাবুর ধানবাড়ি দিয়াছিল ভরত কিস্কুরে দুই মণ! সে ধান ভরতরা দুই মানুষ মাথায় বহে নেয়। আজ ভরত কিস্কু গাড়ি বোঝাই ধান গাদা দিছে, তাতেও দুই মণ হয় নাই, পনেরো সের হইছে। বেশ! আমরা পনেরো সের ধান চাহি আর এক গাড়িই নিব। এই ছেলে দেকো হিসাব, দেকো ওজন বুঝে এ দেখি নিবে। কেমন মহন বাবু! শতজন সন্তাল তোমার হিসাবে পনেরো সের নিবে। গোলা খুলি দাও। এক গাড়ি করে মেপে লই।

মহন চাঁদের দিকে তাকায়, মহনির দিকে। মহনি তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। মহন বলে, চাঁদ! তোর সাথে আমার কোন কথা নাই।

ভরতের সাথে আছে?

মহন বলে, তামাশা বুঝে না ভরত।

আমিও বুঝি না।

দুই মণ ধানে দুই মণ সুদ।

ওজন করো। এ দেখবে।

লেখাপড়া জানা ছেলেটি এগিয়ে আসে। খুব তাড়াতাড়ি ওজন হয়। ভরতের গাড়িতে ধান ওঠে। ভরত এদিক-ওদিক চায়। তার

পর ছুটে গিয়ে মহনির হাঁটু ধরে। মহনি! তুই বা ঠাকুর দেবতা হবি। তুই হতে আমার ঘরে ধান ফেরত যায়। বারহেটের হাট হতে কোন সন্তাল ধান ফিরায় নাই।

চাঁদ বলে, না! ফিরায় নাই। সব দেকো নিছে। তাতেই আমরা চাল কিনি টাকায় পনেরো সের।

চাঁদ সন্তালদের নিয়ে বাজারে বাইরে আসে। চলতে চলতে বলে সকল ধান নিবে যখন, ধান হেথা এনো না। ধান দিলে না বলে বান্ধাবেগার করতে যাবে যখন, তখন সে কথা শুনো না। সন্তাল যেদিন এই দুই কাজের সাহস পাবে, সেদিন দেকো জব্দ হবে।

এমনি করেই আসছিল ১৮৫৫ সাল। আর সন্তাল মেয়েরা সই পাতাচ্ছিল, গ্রামে গ্রামে চলছিল মেলমিতালি। ঝড় উঠছে; বাতাস আসছে, সন্তালে সন্তালে মিত্রবন্ধন থাকে জানিগো। মহনির কথা আগেই বলেছি। মহনি বারবার ছটরায়ের কাছে যেত। এবার ছটরায় ছেনি হাতুড়ি চেয়েছিল। ছেনি হাতুড়ি পৌছাবে কিন্তু তার আগেই দুরন্ত নাগারা রবে ভগনাডি গ্রামের বিশাল প্রান্তর মুখর হয়। শালগাছের ছালের গিরার ডাকে প্রাচীন এক বিশাল বটগাছের সামনে পাথরের উপর দাঁড়ায় সিহু-কানু। তাদের ঘিরে দাঁড়ায় হাজার হাজার সাঁওতাল। আগো! ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন বৃহস্পতিবারে ভগনাডি গ্রামে একি হয়গো? মহনি মাথার কাঠের বোঝা ফেলে দৌড়ে আসতে থাকে দুই হাত তুলে।

কি বল মহনি, তুমি কি বল? সিহু শুন, কানু শুন, বান্ধা-বেগার করে যারা, সে দেকোদের কি ছাড়ি দিবে? তাদের কি ব্যবস্থা? এ কথার উত্তরে হাজার হাজার টাঙ্গির ফলা বাতাসে ঝলসায়। হাজার হাজার সন্তাল বলে,

রাজা জমিদার মহাজন নাই!
বাঙালী পশ্চিমা কারবারী নাই!
নীলকর—হাকিম সাহেব নাই!

পুলিস নাই !

উকিল নাই !

সব "নাই" করি দিব !

থাকবে সন্তাল !

হবে সন্তাল রাজ !

সিতু-কানু কি বলে আর সকলে চেঁচায় "হুলমাহা !"

ভগনাডির মাঠ হতে সবাই কলকাতা পানে যায়, যেতে থাকে। কামার, কুমার, তেলি, মোমিন, চামার এস হে! তোমাদের সঙ্গে কোনো বিবাদ নাই আমাদের! সন্তালরা এস। এ ভাবে যেতে যেতে বারহেট পৌছাতে পৌছাতে কয়েকদিন কাটে। সাঁওতালে সাঁওতালে সে এক উত্তাল সাগর। মহনি দৌড়ায় লালডি। লালডি চলে শত শত সাঁওতাল। লালডি হয় মহন সাহার ঘর। টাঙ্গি, তুলে মহনি দৌড়ায়। ছটরায়ের পায়ের শিকল আমি কাটব। তুই কাটবি? সে জন্য সে বসে আছে? মহনের গমস্তা চেঁচায়, মোরে মারিস না গো মেয়ে। ছটরায় পাথর ঠুকে শিকল ছিঁড়ে লাঙ্গল উঠায়ে মহন সাহারে কাটল। গমস্তার মাথা গড়াগড়ি যায়। লালডি হতে বারহেট। কামিয়া কে আছ, বান্ধাবেগার কোথা, বারাও হে! বারহেট বাজারে দেকো মহাজন নাই। বাজারে লুট কর, দোকানে আগুন দাও, মহাজনেরা কোথায়? থানা কই, পুলিস কোথায়? মহনি আতিপিতি ভগনাডি ফিরে। ছটরায় কোথা, ছটরায়? ঘরে ফিরবে না সে? ঘর জাগায়ে থাকবে মহনি, না হুলে যাবে? ঘোড়ার পিঠে আসে চাঁদ! মহনি! মহনি! গোমানি নদীর তীরে হুলমাহার বিকালে কেন টালুমালু কর? কোন পথে যাব তা ভাবি। যে পথে যাও সেহি পথে হুলমাহা। আমি কোথা যাব? হুলমাহার পথে যা মহনি। ছটরায় কোথা গেল? হুলমাহার পথে গেল। মহনি মানুষের সঙ্গে যায় কিন্তু আকাশ পরগনাইত তাকে ধরে। মহনি! তোমরা যাও পশ্চিমে, কামার লোকদের আন লালডি।

আকাশ পরগনাইত! আমি যাই ছেলের খোঁজে, তুমি মোরে কোন্ কাজে বান্ধা?

মহনি! দিদি! হুলমাহার কাজে।

আমি! আমি করব সে কাজ?

হাঁ দিদি। কামারদের সাথে রাখা বড় দরকার। লড়াই তো হবে। হতেছেও হেথাসেথা। কামার লোক হাতিয়ার বানাবে। বান্ধাবেগার ছিল যারা, তাদের হাতিয়ার নাই।

মহনির ভিতরে কোন আগুন শান্ত হয়। সে বলে, যাব, আনব কামারদের। শাল ছালে গিরা বেন্ধে দে হাতে দেখি। ভাল করে বান্ধিস আকাশ!

মহনির হাতে গিরা, মহনি কামারদের আনে। মহনি আর মেয়েদের নিয়ে ছাতু পিষে চিড়া কোটে। হুলমাহা কি উপাসী পেটে করবে ছেলারা? কামাররা কাজ করে যেখানে, সেখানে আসে যায় লড়াকু সন্তালরা। হঁ গো তোমরা আমার ছটরায়কে দেখ নাই? দেখেছি, দেখি নি, কত কথা, কত কথা!

অবশেষে ধিমাধিমা বর্ষার সাজনে আকাশ ঘন হয়ে নামতে থাকে, কে যেন খবর দিয়ে যায় যে ছটরায় চাঁদের দলে যোগ দিয়ে পীরপৈঁতি পাহাড়ের গিরিসংকটে যুদ্ধে গেছে। যুদ্ধে গেছে। পীরপৈঁতিতে? মহনি সন্ধ্যার আঁধারে মিশে যায়। হায় ছটরায়, আমি তোকে খুঁজি। তুই আমাকে খুঁজিস, তবুও দেখা হয় না কেন? কামারদের বলে যায়, আমি ছেলের খোঁজে যাই গো, আবার আসব।

পীরপৈঁতির যুদ্ধে সাহেবদের সঙ্গে মহড়া নিতে সিহু কানু যেখানে সেখানে ছটরায় নাই। সিহু কানু বলে, সে আছে আকাশ পরগনাইতের সঙ্গে, আগে। সেথা তুমি যেতে পারনা মহনি, এ হয় যুদ্ধ।

সন্তালদের মোর্চায় দ্রিমিদ্রিমি নাগারা বাজে আর বাজে। সামনে সামনে পাহাড়ের ঢালে, আকাশ পরগনাইত ও চাঁদ মুর্মুর মোর্চার উপর সহসা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে। সাঁওতালরা তীর

ছোড়ে। বন্দুক ও তীর। সাঁওতালরা "হুল হুল" বলে পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে থাকে। ভীষণ যুদ্ধ, পাথর গড়ায় নিচে। মহনি চোখ বুজে থাকে। আহতদের চীৎকার সে শুনবে না। সাহেব সেনাপতি কি বলে চেঁচায়। সহসা ছটরায়ের গলায় চীৎকার, আকাশ পরগনাইতের লাশ দিব নাই! —মহনি সংবিৎ ফিরে পায় ও আর্তস্বরে ডাকে, ছটরায়। ছটরায় আবার বলে, আকাশ পরগনাইত আমাদের! ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ। এখন পাহাড় বেয়ে সিহু কানুর দল জল-স্রোতের মত অজস্র হয়ে নামতে থাকে। সাহেবরা পলাচ্ছে, পলাচ্ছে। ভীষণ বৃষ্টি নামে। পাহাড়ী নালা ফুলে কেঁপে ওঠে। অজস্র বৃষ্টি-ধারায় মহনি নেমে আসে। সে খুঁজে পাবে, ঠিক খুঁজে পাবে ছটরায়! মহনি আবারও ডাকে, আবারও। আকাশ পাগল হয়ে বুক চাপড়ে জল ঢালে সাঁওতালদের উপর।

বৃষ্টি থামলে অন্ধকার ও শান্ত সব। মশাল হাতে সাঁওতালরা এগোতে থাকে। চাঁদ বলে, আকাশ কোথা, আকাশ পরগনাইত?

এখানে।

কে, মহনি?

হাঁ।

আকাশ?

এখানে।

এ কে? আকাশকে আগলে ধরে আছে?

ছটরায়।

ছটরায়? ছটরায়? হাঁ, সেই তো।

মহনি ঈষৎ হাসে। বলে, আকাশকে ছাড়ে নাই। দুজনের মাথা আমার কোলে চাঁদ, নামাও।

চাঁদ নিচু হয়।

ভোর হতে থাকে, আকাশ ফিকা হয়। মহনি বলে, কোমর হতে, ছটরায়ের কোমর হতে গেঁজেটা দাও।

কি আছে এতে ? ঝনঝন করে ?

কেন ? ওর পায়ের শিকল ?

শিকল নিয়ে মহনি লালডির দিকে যায়। ছেঁড়া শিকলটা ছটরায় কেন বয়ে বেড়াচ্ছিল ? কেন ? আর জানা যাবে না। মহনি মাথা নাড়ে বারংবার। লালডিতে যাবে মহনি, শিকল ছেঁড়া লোহা কামারদের দিবে। কামাররা বান্ধাবেগারদের জন্যে হাতিয়ার বানায়, নয় ? তারপর ? মহনি আবার মাথা নাড়ে। হুলমাহা যা বলে সে তা করবে। হুলমাহার কাজ। অন্য কোন কাজে তো সে ছটরায়কে পাবে না। মহনি বনের পথে ঢুকে যায়। এ পথে লালডি তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে। ছটরায় রে। কোন্ বা শিকলে মহনিকে হুলমাহার কাজে বেন্ধে রেখে গেলি ?